আটপৌরে রবীন্দ্রনাথ
গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যা

আটপৌরে রবীন্দ্রনাথ

গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

কবির স্নেহধন্যা—

মামণি

মাংপবী

হয়-রানী

নয়-রানী-

কে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

মহালয়া
১৩৭৫

গৌরসুন্দর

মামণি—শ্রীমতী প্রতিমা দেবী
মাংপুবী—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
হয়-রানী—শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ
নয়-রানী—শ্রীমতী রানী চন্দ

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ কবি। কি দেশে কি বিদেশে সর্বত্রই কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি। কিন্তু সেই কবি রবীন্দ্রনাথের আড়ালে তাঁর আর একটি পরিচয় আমরা পাই, সেটি মানুষ রবীন্দ্রনাথরূপে। কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন অসাধারণ, মানুষ রবীন্দ্রনাথও তেমনই অসামান্য।

যেমন বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি, তেমনি বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারা। সেই মানুষটির সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, প্রাত্যহিক পরিবেশে তাঁকে দেখবার সুযোগ যাঁদের ঘটেছে, তাঁদেরই বিবরণ থেকে এবং তাঁর লেখা অসংখ্য চিঠিপত্র থেকে তাঁর এই ঘরোয়া পরিচয়টি আমি সংগ্রহ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া পরিবেশের একখানি অপ্রকাশিত ছবি এই পুস্তকে দিয়েছি। ছবিখনি সংগ্রহ করিয়া দিয়েছেন—বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনের শ্রীযুক্ত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শেষে স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই গ্রন্থখানি লেখার মূলে আছে বন্ধুবর প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের অকুণ্ঠ উৎসাহ। তিনি এই গ্রন্থের প্রকাশের ভার নিয়েও আমাকে ঋণী করেছেন। ইতি—

মহালয়া
১৩৭৫

গৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

বিষয় সূচী

রবীন্দ্রনাথের মাতুল জগদীশচন্দ্র, যোগেশ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,
[illegible] ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পাশে রয়েছেন সরলা দেবী

জীবন প্রভাত

পঁচিশে বৈশাখ কেবলমাত্র ভারতের ইতিহাসে নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই শুভদিনটিতে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ। সেটা ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, সোমবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। সময় শেষরাত্রি সুতরাং ইংরাজী মতে ৭ই মে, মঙ্গলবার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্বসমেত পঞ্চদশ সন্তান। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চতুর্দশ এবং নয়টি পুত্রের মধ্যে অষ্টম। সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ পুত্র বলেই পরিচিত, কারণ তাঁর পরবর্তী ভাই বুধেন্দ্রের জন্মের অল্পকাল পরেই মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালকে আমরা ভারতের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণ বলতে পারি। এই সময় কি সামাজিক জীবনে, কি রাষ্ট্রিক জীবনে একটা বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। এই বিপ্লবের মধ্যে ঠাকুরপরিবার সর্ববিষয়ে একটা বৈচিত্র্য রক্ষা করে চলেছিল যে বৈচিত্র্য একান্তভাবেই ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব।

শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভিতর এই বৈচিত্র্যের পরিচয় আমরা পাই।

পিতা থাকতেন বাইরে। বহু-সন্তানবতী মায়ের সঙ্গও দুষ্প্রাপ্য ছিল। দেখাশুনার ভার ভৃত্যদের উপর ন্যস্ত। যার নাম কবি দিয়েছেন 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র'। চারিদিকে বন্ধন। শ্যামের গণ্ডি পার হলেই বিপদ, যে বিপদ ঘটেছিল সীতার। জানলার নীচে একটা ঘাট বাঁধানো পুকুর ছিল। কাছেই ছিল একটা চীনা বট আর নারকেল গাছ। শিশুরবি বসে বসে দেখতেন নানা মানুষের

নানাভাবে স্নান করা। গরম কালের সন্ধ্যাবেলায় ফেরিওয়ালা হাঁক দিত 'বরীফ' অর্থাৎ কুলপি বরফ, ফুলওয়ালা হাঁক দিত 'বেলফুল'। আবহুল মাঝির কাছে পদ্মার গল্প শুনতেন। কখনো নিজেকে মাস্টার মনে করছেন, ছাত্র হচ্ছে রেলিংগুলো। কখনো বারান্দার এক কোণে আতার বিচি পুঁতে জল দিচ্ছেন—ভাবছেন তা থেকে গাছ হবে।

মনে হতে পারে না-জানি কত বিলাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ভুল। কবি নিজেই বলছেন, "আমাদের শিশুকালে ভোগ-বিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়।" সাজ-পোশাক, খাওয়া-দাওয়া অতি সাদাসিধে ধরণের ছিল। কবির কথায়, "আমাদের চাল ছিল গরীবের মতো।"

বাড়ীর আবহাওয়াটা ছিল আর্টের। গান, বাজনা, সাহিত্য, নাট্যকলার চর্চা চলত বাড়ীতে। এই আবহাওয়া যে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিল সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তাঁর ভিতর যে বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাই সেটা এই বিদগ্ধ পরিবেশেরই ফল। অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ এবং রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন বাড়ীতে। শিক্ষকের নাম মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। পরে স্থির হলো সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ যাবেন স্কুলে। স্কুল কি সে ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। হয়তো ভেবেছিলেন স্কুল একটা আনন্দের জায়গা। তাই যখন সোমেন্দ্রনাথ এবং সত্যপ্রসাদ স্কুলে গেলেন, তাঁকে বাদ দেওয়া হোলো, তিনি কান্না সুরু করলেন। কোনোদিন বাড়ীর বার হন নি, গাড়ীও চড়েন নি। জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "...সত্য যখন ভ্রমণবৃত্তান্তটিকে

অতিশয়োক্তি-অলংকারে প্রত্যহই অত্যুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল তখন ঘরে আর মন কিছুতেই টিকিতে চাহিল না।”

বয়স তখন ছয় কি সাত। বায়না ধরলেন দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের মতো তিনিও স্কুলে যাবেন। সেই সময় গৃহশিক্ষক মাধব পণ্ডিত মশায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—“এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদিতে হইবে।” তাঁর এই উক্তি মিথ্যা হয় নি।

১৮৬৮ সালে সাত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হোলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী তখনকার দিনের একটা নামকরা স্কুল। এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে বেশীদিন ছিলেন না। কতদিন ছিলেন, কেন এ স্কুল ছাড়লেন তার কোন কারণ জানতে পারা যায় না। এখান থেকে ভর্তি হলেন নর্মাল স্কুলে। নর্মাল স্কুল তখন বসত সংস্কৃত কলেজের বাড়ীতে। এই স্কুলে ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলেন।

নর্মাল স্কুল থেকে ভর্তি হোলেন বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে। এটা ছিল একটা ফিরিঙ্গী স্কুল। এই স্কুলে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। উপনয়নের পরে কিছুদিনের জন্য তিনি পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে পুনরায় বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে যেতে হোলো। স্কুলে মন বসে না। স্কুল পালাতে আরম্ভ করলেন।

বেঙ্গল অ্যাকাডেমি থেকে ভর্তি হোলেন সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে। সেটা বোধহয় ১৮৭৪-৭৫ সাল। তখনকার দিনের ‘ফিফ্‌থ ইয়ার বা প্রিপ্যারেটরি এণ্ট্রান্স’ ক্লাসে এক বৎসর ছিলেন। বাৎসরিক

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন—প্রমোশন পান না। সম্ভবতঃ এখানেই স্কুলের পড়াশুনায় ইস্তফা দেন। (প্রিপ্যারেটিরি এণ্ট্রান্স ক্লাস বোধহয় বর্তমানের নবম শ্রেণী।)

সত্তর বৎসর বয়সে একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি, "আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাশ করিনি; মাস্টার আমার ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস।"

অভিভাবকগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যে পাঠাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকমাস কাটিয়ে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮ বিলাত যাত্রা করলেন। বয়স তখন ১৭ বৎসর ৫ মাস। সেখানকার এক পাবলিক স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁকে লণ্ডনে আসতে হোলো। এখানে এসে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি হোলেন। বোধহয় মাস চারেক এখানে পড়েছিলেন। কারণ পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথকে দেশে ফিরতে হয় (ফেব্রুয়ায়ী, ১৮৮০)। ১ বৎসর ৪ মাস তিনি বিলেতে ছিলেন। স্কুলে বা কলেজে, দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নের পালার এখানেই সমাপ্তি। অবশ্য দেশে ফিরবার কয়েক মাস পরে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যে আর একবার বিলাত যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু যাওয়া হয় নি। মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন।

পরিণত বয়সে একবার ইন্দিরা দেবীকে লেখেন, "ভাগ্যি আমি ব্যারিষ্টার হই নি।"

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের চেষ্টা সফল না হলেও বাড়ীতে শিক্ষার যে বিবিধ ব্যবস্থা ছিল সেটা নিষ্ফল

হয় নি। সারাদিনের বিদ্যাভ্যাসের একটা নির্ঘণ্ট রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন—চারুপাঠ, বস্তু বিচার, প্রাণি-বৃত্তান্ত, মেঘনাদবধ কাব্য, পদার্থ বিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ড্রয়িং, ইংরেজি, যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ। এ ছাড়া ছিল জিমন্যাস্টিক ও কুস্তি করা। জিমন্যাস্টিক ও কুস্তির ফল কিনা জানি না—তবে রবীন্দ্রনাথের দেহ সত্যই বলিষ্ঠ ও সুগঠিত ছিল। 'ছেলেবেলা'য় লিখেছেন, "শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো।"

সাধারণ বিদ্যাভ্যাস ছাড়া গানও শিখতে হত' বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে।

কবিতা লেখার চেষ্টাও এই সময়। এ বিষয়ে গুরু হলেন—ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

অপরূপ রূপ

জানি না বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাসের দৈহিক সৌন্দর্য কেমন ছিল। জনশ্রুতি, কালিদাস দেখতে কুৎসিত ছিলেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, নাম থেকেই বুঝায় ব্যাসদেব কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। বাল্মীকি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? রূপ ও গুণের অপূর্ব সমাবেশ তো আর দেখা যায় না। মনে হয় বিধাতা যেন নিভৃতে বসে রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি যে কত বড় শিল্পী ও রূপকার তা রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকালেই বুঝা যায়।

চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যের অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোলযুগে'[১]—"সেদিনকার সেই দৈবত আবির্ভাব যেন চোখের সামনে আজও স্পষ্ট ধরা আছে। সুষুপ্তিগত অন্ধকারে সহসোত্থিত দিবাকরের মত। ধ্যানে সে মূর্তি ধারণ করলে দেহ মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, 'বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণ' নতুন করে প্রাণ পায়। সে কি রূপ, কি বিভা, কি ঐশ্বর্য! মানুষ এত সুন্দর হতে পারে, বিশেষতঃ বাংলা দেশের মানুষ, কল্পনাও করতে পারতুম না। রূপ-কথার রাজপুত্রের চেয়েও সুন্দর, হয়তো দুর্লভদর্শন দেবতার চেয়েও। ...পরনে গরদের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, কাঁধে গরদের চাদর, শুভ্র কেশ আর শ্বেত শ্মশ্রু—ব্যক্তমূর্তি রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম।" শ্রীপ্রমথনাথ বিশী দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন[২]—"শচীর মণিমাণিক্য জড়িত পানপাত্রে

---

১ কল্লোলযুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃঃ ৮৭-৮৮

২ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১২৭-২৮

স্বর্গের অমৃত স্থান পাইয়াছে। বিধাতা যে শিলাখণ্ড দিয়া রামায়ণ-মহাভারতের যুগের বীর ও মনীষীদের গড়িয়াছিলেন, তাহারই খানিক যেন তাঁহার শিল্পশালার একান্তে পড়িয়া ছিল ; বহুযুগ পরে বিধাতাপুরুষ তাহা দিয়া রবীন্দ্রনাথকে গড়িয়াছেন। তাঁহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের চরম প্রকাশ আর তাঁহার জন্মমুহূর্তে প্রত্যেক দেবতা আপনার ডালি উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন এই নবজাত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের ভাগে। ...মহাকবি যখন প্রতিভাভাস্বর মূর্তি লইয়া, প্রাচীন হস্তিদন্তাভ অঙ্গচ্ছটায়, শিথিলপিনদ্ধ পোশাকের বদান্যতায় রাজকীয় মহিমায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে যুগপৎ ভীতি ও বিস্ময় উদ্রিক্ত হইত ; মনে হইত দেবরাজ যেন কৌতুক ও কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া মর্তে অবতরণ করিয়াছেন। দেবরাজই বটে !"

সীতা দেবী বলছেন[১]—"বিধাতা তাঁহাকে রূপ দিয়াছিলেন অলোকসামান্য। তাঁহার নিখুঁত আর্টিস্টের দৃষ্টি এবং রুচিও সর্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিত, কখনও তাঁহাকে এমন পোশাক পরিতে দেখি নাই, যাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের একটুও হানি হয়।"

মৈত্রেয়ী দেবীর কথায়[২]—"যদি রূপের কথা ভাবা যায়, এত রূপও যে মানুষে সম্ভব তা কে জানত ? ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ। অপার্থিব জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য, অপার্থিব মধুময় কণ্ঠস্বর ...।"

---

১ পুণ্যস্মৃতি—সীতাদেবী, পৃঃ ২২৪

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ১৩৮

প্রমথবাবু একদিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন[১]—"আমি আমবাগানের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন, এতই ত্বরা যে, পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়াই মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন, সম্মুখেই পড়িল মেহেদিগাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন, অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুণ গুণ করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেনঃ 'ভ্রমর যেথা হয় বিবাগী নিভৃত নীলপদ্ম লাগি।' ব্যাপার কি বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটি তখনই রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন; ভুলিয়া যাইবার আগেই গানটি দিনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দেবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছেন।...তাঁহার গায়ে ছিল লম্বা বর্ষাতি; তাহাতে জল ঝরিতেছে, হাতের ছাতিটা বন্ধ; হয়তো পথে খুলিয়াছিলেন, কিন্তু গাছের ডালপালায় বাধিয়া গিয়াছিল, তাই বন্ধ করিয়াছেন; কিংবা হয়তো খুলিবার কথা আদৌ মনে হয় নাই।...প্রাচীন কাব্যে গজরাজের পদ্মবন ভাঙিয়া চলিবার কথা পড়িয়াছি; এতদিন এই চিত্রটাকে কবিদের কৃত্রিম অলংকার মাত্র মনে হইত। কিন্তু সেদিন নরশ্রেষ্ঠের এই ত্বরিত গতি দেখিয়া আমার মনে ওই উপমাটা এক মুহূর্তে নূতন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।...সবশুদ্ধ মিলিয়া সে যেন এক আবির্ভাব!" আমরা শুধু বলব—চমৎকার!

একবার ৭ই পৌষের উৎসবে কবি এসেছেন মন্দিরে বক্তৃতা দিতে। নন্দগোপাল বাবু কবির সেদিনের মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন[২]—"...শুভ্র শ্মশ্রু উড়ছে, উত্তরীয় উড়ছে, চন্দনচর্চিত ললাট কুঞ্চিত,

১ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১৩১-৩২

২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৭

প্রসারিত হচ্ছে কথার তালে তালে—সেই সঙ্গে ঝুলছে আভূমি প্রলম্বিত কোঁচা—এমন অপূর্ব ভঙ্গিমাময় অভিব্যক্তি তাঁর আর দেখিনি কোনদিন।" উচ্ছ্বাস সহকারে এণ্ডরুজ সাহেব বলেছিলেন —"He looked like Christ in his years."

শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, তাঁর রবীন্দ্র-সন্দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন[১]—"শালপ্রাংশু মহাভুজ কবি···দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া ছিলেন···। দীর্ঘ প্রবাসান্তে ইউরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়াছেন। গায়ের রং টক্ টক্ করিতেছে। বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া ···প্রণাম করিতেও বিস্মৃত হইলাম।" কবি যখন যুবক, দীনেশ সেন গিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ী। কবির চেহারা দেখে একজনকে লিখছেন[২] —"ঠাকুরবাড়ীর প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া, দোতলার সিঁড়ির মুখেই রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল,···দেহছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা চক্ষু ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না, রবিঠাকুরের অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত।"

বুদ্ধদেব বসু গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। কবি অল্প দিন হল রোগশয্যা ছেড়ে উঠেছেন। কবির সেই সময়কার চেহারার বর্ণনা দিচ্ছেন বুদ্ধদেববাবু[৩]—"সেই চিরপরিচিত মহান্ মুখশ্রী, সেই তীক্ষ্ণ আরক্ত-অপাঙ্গ চোখ, সেই উদার গম্ভীর স্বচ্ছ

১ আত্মস্মৃতি, ১ম—সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ১০২

২ এই যা দেখা—লীলা মজুমদার, পৃঃ ৫০

৩ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১৫

ললাট। আমার বরাবরই মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চোখ যেন কোনো মোগল সম্রাটের চোখের মতো, তাতে তাঁর কবিপ্রতিভা যত না ধরা পড়ে তার চেয়ে একথাটাই বেশি ফোটে যে তিনি স্বভাবতই রাজা।" বুদ্ধদেব বাবু বলেন[১]—"বয়স যত বেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ততই সুন্দর হয়েছেন।"

ময়ূর সুন্দর কিন্তু কর্কশ তার কণ্ঠস্বর, চেহারার সঙ্গে সুরের এই অসঙ্গতি বড়ই বেমানান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বাবুর কথা উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে[২]—"তাঁর কথা যেন বর্ণাঢ্য গীতি-নিঃস্বন, যেন গীতি-ধ্বনিত ইন্দ্রধনু, তা' যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি মনোবিমোহন।" কবির কণ্ঠস্বরকে বুদ্ধদেববাবু বলেছেন—"স্বর্ণঝংকৃত কণ্ঠস্বর।" বিধাতা তাঁর ভাণ্ডারে যা কিছু ছিল সবই অকৃপণ হস্তে দান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। কবি নিজেও সেকথা বলেছেন—"বিধাতা মুক্ত হস্তেই দিয়েছিলেন···।"

একবার রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ী, সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ। রামেন্দ্রসুন্দর বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে আসেন। রামেন্দ্রসুন্দর এলে তাঁর মা বললেন—"রামেন্দ্র, আজ আমাদের বাড়ীতে কারা এসেছিল বল তো? দুটি সুন্দর ছেলে—একটি খুব ছেলেমানুষ আর একটি কিছু বড়ো, তারা তোর জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেল। যে ছেলেটি বড়ো সে ঘরের মাঝখানে চৌকিতে বসেছিল আর সমস্ত ঘরটা যেন আলোয় ঝলমল করে উঠেছিল। আমার ত' অনেক বয়স হয়েছে···এরকম ত' কখনো দেখিনি। একটা মানুষ ঘরে

১ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ৯৮

২ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১০১

বসলো আর সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে গেল।"[১] বলা বাহুল্য ইনিই রবীন্দ্রনাথ।

কবির বয়স তখন ৩৩। রানাঘাটে কবি নবীন সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। নবীন সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন—"...কি সুন্দর, কি শান্ত, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগ বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা; কুঞ্চিত অলকশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্বশ্মশ্রুশোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশ্‌মা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে।"

দিলীপকুমার লিখছেন[২]—"তাজমহল যেমন দিনে রাতে নানা আলোর নানা রঙে ফুটে ওঠে অভাবনীয় হ'য়ে—উষালোকে একরকম, দীপ্ত মধ্যাহ্নে আর একরকম, অস্তরাগে একরকম, চাঁদনি রাতে আর একরকম—রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর নানা মুহূর্তে আমার চোখে নানা রঙে প্রতিভাত হতেন।"

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'মানুষ রবীন্দ্রনাথে' কবির রূপের বর্ণনা দিয়েছেন[৩]—"প্রথম বিস্ময়ের বিহ্বলতা একটু কেটে গেলে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে কবিকে দেখতে লাগলুম। তাঁর চুল ও দাড়ির বিশেষত্ব হচ্ছে, তা' শুধু ধবধবে, চক-চক নয়; তা'

১ যুগান্তর-সাময়িকী,—মৃণাল ঘোষ ১৫, বৈশাখ, ১৩৭০

২ স্মৃতিচারণ, ২য়—দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১২৭

৩ মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১১-১২

রেশমী, পরিষ্কার ও মসৃণ। কথা বলার সময় তাঁর সুডোল, প্রশস্ত ললাটে চিন্তার গভীর রেখা পড়ে। ভ্রূর শেষে কপালের শেষ প্রান্ত দুটি একটু চাপা, হয় তো বার্ধক্যের দরুণ। চোখ দুটি বিশাল নয়,—আয়ত দেবচক্ষুর মত। খানিকটা স্বাভাবিক নিমীলিত ভাব। চোখের তারায় প্রখর দীপ্তি অথচ তার মধ্যে আছে আত্ম-সমাহিত অন্তর্মুখীনতা। কান দুটি মুখের অন্যান্য অংশের তুলনায় বড় এবং স্থূলতায় ভারী। নাকটি দীর্ঘ, প্রসারিত, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। কিন্তু আমরা যাকে বাঁশির মত নাক বলি, তেমন নয়। হাতের আঙুলগুলি মোটা-মোটা, মাথার দিকে অল্প ছুঁচালো, মনে হয় আঙুলের গড়ন নিছক শিল্পিপ্রকৃতির নয়, মিশ্র প্রকৃতির। সুঠাম, আজানুলম্বিত, বলিষ্ঠ তাঁর বাহু দুটি। তাঁর জামার গলার বোতাম খোলা ছিল। ঘাড়ের দু-পাশের সীমান্তে অপরূপ বাঁকা রেখার সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছিল। তাঁর হাতে, মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে আছে যেন কোন মূর্তিকারের সযত্নে আঁকা, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট (sharp) সীমান্ত-রেখা।

"দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে মনে হত, তাঁর মুখখানি বুদ্ধের প্রশান্ত লালিমায় অপরূপ। কিন্তু আজ কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলুম, তাঁর মুখের দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে প্রশান্তির গরিমার চেয়েও বিশাল ব্যক্তিত্বের দীপ্তি এবং তেজ। মনে হল, তাঁর বাইরের রূপ অপরূপ হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তরের ব্যক্তি-সত্তার সৌন্দর্যে। তিনি যে কোথাও সাধারণ নন, তিনি যে অপর দশ-জনের একজন নন, তিনি যে অসামান্য, তা' তাঁর চোখে, মুখে, অঙ্গে অঙ্গে পরিস্ফুট। শুধু দেহে কেন, চলনে, বলনে, আচারে-ব্যবহারে, বেশ-ভূষায়—কোথাও তিনি নিজেকে বেমানান করে ফেলেন না।

মানুষের দেশে তিনি জন্মেছেন রাজার আকৃতি ও মহানায়কের প্রতিভা নিয়ে। তাই পৃথিবীর দিকে দিকে অধিকার করেছেন মানুষের হৃদয়ের রাজাসন।"

মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ কবিকে কি চোখে দেখেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। লণ্ডনের একজন ধর্মযাজক লিখেছেন,[১]—"আমার মনে আছে আমি যখন তাঁর দীর্ঘ পরিচ্ছদাবৃত মূতি দেখলাম আমার মনে হ'ল আমি যেন মানুষ নয়, কোনো দেবতার সামনে এসেছি, পরে আমি অনুভব করেছি এই উপস্থিতি যেন কাব্যময় আত্মার জীবন্ত রূপ—অন্তরস্থ আত্মিক লাবণ্যের বহিঃপ্রকাশ। এই জন্যই ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যেন একটি ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া; মন্দিরবেদীর সামনে কোনো অনুষ্ঠানের চেয়েও এই মানুষটির সংস্পর্শ আমার মনকে রহস্যময় ভক্তি ও বিস্ময়ে পূর্ণ করেছে।" আর. জি. ক্যাম্পবেল তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসন্দর্শনের কথা লিখেছেন[২]—"সে দিনের অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে চির-উজ্জ্বল, আমার চিন্তায় বারে বারে সেই দিনটি ফিরে আসে। কবির দেহ-সৌন্দর্যও কেউ কখনো ভুলতে পারে না।...ন্যাযারেথের যীশুর রক্ত-মাংসের দেহের সম্বন্ধে মানুষের মনে যে আদর্শটি আছে তার সঙ্গে এমন সাদৃশ্য আর কোনো নরদেহে দেখিনি।" আমেরিকার ইয়েল্ ইউনিভারসিটির এক সভায় কবি উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সে দিনের দেহ-সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে[৩]—

১ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ৪৩

২ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ৪৫

৩ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ৮৬

"তাঁর অঙ্গে ছিল মাটির রং-এর আঙ্গরাখা, ঘরের স্বল্প আলোতে তাতে একটা বেগুনী ভাব দেখা গেল। ঐ রং তাঁর শরীরের বাদামী রং-এর আভার সঙ্গে অপরূপ লাগছিল—তাঁর কেশ মাথার উপরের অংশে সম্পূর্ণ শুভ্র, কিন্তু অল্প অল্প করে নীচের দিকে গাঢ় হয়ে এসে কুঞ্চিত হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো শিল্পী তুলি দিয়ে সাদা থেকে গভীর করে রং বুলিয়ে দিয়েছে—একেবারে যীশুর প্রতিমূর্তি,...।" আমেরিকার আইওয়াতে কবি একটি ভাষণ দেন। সুধীন্দ্রনাথ বসু লিখছেন[১]—"তাঁর নরম কেশগুচ্ছ ঘাড়ের কাছে কুঞ্চিত, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের ওপরে ঝরে পড়েছে। ধূসর রং-এর আঙ্গরাখায় আবৃত দেহ, আর করুণা-উজ্জ্বল মুখচ্ছবি প্রথমেই দর্শকদের মনোহরণ করেছে। অনির্বচনীয় শান্ত মহিমময় মূর্তি। আমার মনে হল যখন উত্তোলিতবাহু এই হিন্দু, ক্রিশ্চান শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁকে একেবারে তাঁদেরই সনাতন সাধুসন্তদের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়েছিল।" আমেরিকার রিপোর্টাররা লিখছেন[২]—"তাঁর সুন্দর সুগঠিত মাথার ডৌলটি কালো মখমলের মত, তার মধ্যে বিভক্ত কুঞ্চিত কেশদামের উপরিভাগে রূপালী তুষারের কণার মত সাদার আভাস—মহিমময় উন্নত ললাট, অপূর্ব চোখে আশ্চর্য অপার্থিব দৃষ্টি, অভিজাত 'পাঁশনের' গোল রেখা, সর্বোপরি তাঁর মুখের শান্ত সুকুমার স্বর্ণাভ সৌন্দর্য যেন সূর্যালোকিত ভারতের আলোর রঙ্গে রঙ্গীন।" ফ্রান্সের 'প্যালেস দ্য জাষ্টিস'-এ একটি সম্মেলন। একজন লিখছেন[৩]—

১ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ৯৯

২ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ১০৬

৩ বিশ্বসভায় ররীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ২০৬

"...এক মহিমান্বিত রাজকীয় মূর্তি...তিনি তাঁর চশমাটি খুলে ফেললেন। বিচ্যুত চশমাটি তাঁর বৃহৎ বেগনি রঙের আঙ্গরাখার গায়ে বিলগ্ন হয়ে আকাশে তারার মত জ্বলতে লাগল—আমাদের চোখের সামনে আবির্ভূত হল একটি মুখ—সে মুখ খৃষ্টের মত, তেমনি ব্রঞ্জ রং-এ আঁকা, তেমনি সমাহিত, তেমনি অভাবনীয়—।" কবি ক্যানাডায় গেলে সেখানকার সংবাদপত্র একটি সভার বর্ণনা দিচ্ছে,[১] —"তিনি সভামঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন, শুভ্র বিলম্বিত শ্মশ্রু, বিস্তৃত স্কন্ধদেশের উপর শুভ্র চুলের গুচ্ছ বিলগ্ন, দীর্ঘ পরিচ্ছদে আবৃত দেহ, সেই মূর্তি সমগ্র শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করেছিল।...যখন তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করছিলেন তাঁর মুখের রেখায় রেখায়, উজ্জ্বল কালো চোখে, বঙ্কিম নাসায়, ওষ্ঠের সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় অপূর্ব সৌন্দর্যরূপ আর তাঁর চতুর্দিকে মোহমুক্ত শান্তি বিকীর্ণ হচ্ছিল।" আমেরিকার সাংবাদিকরা এক জায়গায় লিখছেন[২]— "ছ-ফুটের উপর দীর্ঘ শরীর আপাদলম্বিত দীর্ঘ পরিচ্ছদাবৃত, শুভ্র কুঞ্চিত কেশদামে শোভিত মস্তক রবীন্দ্রনাথকে দেখলে তুষার-আবৃত-শিখর উত্তুঙ্গ পর্বতের কথা মনে পড়ে।" কবি পাশ্চাত্ত্যের যে দেশেই গিয়েছেন সেখানেই তাঁকে খৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জনৈকা আমেরিকান মহিলা তাঁর পাশের অপর একজনকে বলেন —"তোমার কি মনে হয় না এঁর মুখ একেবারে খৃষ্টের মত?"

অমল হোম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁর বিবাহসভায় উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। একখানা

১ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ২২৫

২ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ২৬৪

চিঠিতে শরৎচন্দ্র অমল হোমকে লিখছেন—"অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য, জগতে এত বড়ো বিস্ময় জানি না।" কবির বয়স তখন ৬৬।

রবীন্দ্রনাথের প্রাত্যহিক পোশাক সম্বন্ধে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মশায় লিখেছেন[১]—"তাঁর প্রাত্যহিক পোশাক ছিল পায়জামা ও ঢিলে পাঞ্জাবী অথবা আলখেল্লা।...বার্ধক্যে চলৎশক্তির শ্লথতাহেতু পায়জামা ছেড়ে তার বদলে পরতেন একটা আধা-লুঙ্গি আধা পেটিকোট ধরনের জিনিস...। আমি দেখেছি তাঁকে বেশির ভাগ সময়ই কমলা নেবু রঙের খদ্দর ব্যবহার করতে—মটকা বা গরদও পরতেন মাঝে মাঝে, কিন্তু বেশি না। শীতকালে কালো বা ছাই রঙের একটা গরম হোজ পরতেন—অনেকটা বিলেতী গ্রেট কোট আর ভারতীয় সেরওয়ানীর মিশেলে তৈরী একটা নূতন ধরনের জামা। তার উপর শাল নিতেন একখানা। ...প্রচণ্ড গরমেও দেখেছি অবলীলায় পুরু খদ্দর পরে গভীর অভিনিবেশ সহকারে লেখাপড়া করছেন—আবার দারুণ শীতেও সূতী কাপড়ে বেশ আছেন। ... বাইরে বেরুতে হলে ... পরতেন পায়জামা এবং মাথায় নিতেন ইরানী টুপি। ...জুতো বলতে আমি শুধু বৃহদায়তনের চটিই ব্যবহার করতে দেখেছি। ...ধুতি পাঞ্জাবী ও চাদরে সজ্জিত হতেন ৭ই পৌষ এবং জন্মতিথি উৎসবে।"

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর—কবির স্নেহভাজন—দীর্ঘকাল কবির সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল—তিনি বলছেন[২]—"কবির বেশভূষার বিশেষত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদিকে নিজের রুচিকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন। একটি ঢিলে পাঞ্জাবী এবং

---

১ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৪, ৩৭, ৩৮, ১৬

২ কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর, পৃঃ ১৫

দোস্তী মোটা লুঙ্গি বা পাজামা—এই ছিল তাঁর সাধারণ পরিধেয়। সে-সব বাছাই-করা খুব সূক্ষ্ম বা দামী কিছু নয়, সাধাসিদে মাঝারি গোছের ছিল। অনেক সময় দুটো পাঞ্জাবী একসঙ্গে পরতেন ; ভিতরের দিকেরটা থাকত ঘাম শুষতে। বাড়ীতে পরবার কাপড়-চোপড় খদ্দরেরই ছিল বেশি। .. বেশভূষার রঙের বৈচিত্র্য ছিল তাঁর পছন্দ। হয় গেরুয়া, না হয় সাদা- এ দুরঙের কাপড় ছিল আটপৌরে। মন্দিরের উপাসনা বা কোনো সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে বেরুতে নিতেন সাদা ধুতি ও জামা—চাদর ;—না হয় তাঁর দরবারী পোশাক ছিল আলখেল্লা। ছিল তা নানা রঙেরই। সাজে রঙের বাহার লাগত ঋতু-উৎসবগুলিতে। বর্ষায় কালো বা লাল, শরতে সোনালী, বসন্তে বাসন্তী রংএ চোখ ঝল্-সাতো তাঁর রেশমী উত্তরীয়।" এ সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলছেন[১]—"সাধারণত তিনি পায়জামাও ঢিলে পরিতেন ; উৎসবাদি উপলক্ষে গরদের ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী ; আর বিদেশ-ভ্রমণে তাঁহার মাথার উঁচু টুপি এখন বিশ্ববিখ্যাত।" রাণী চন্দের লেখায় পাই[২]—"পরনে তাঁর একটি খয়েরী রঙের লুঙি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী। অস্পষ্ট চাঁদের আলোকে এ যেন একখানি ছবি দেখছি।" আর এক জায়গায় লিখেছেন[৩]—গুরুদেব যখন যে রঙের জামাকাপড় পরেন, তাতেই যেন তাঁকে অতি সুন্দর মানায়। আজ সাদা লুঙি, পাঞ্জাবী পরেছেন—এই শুভ্র সাজে যেন ঘর আলো করে বসেছেন।" কবির অন্যতম ভক্ত ও সহচর সুধীরচন্দ্র কর মহাশয় তাঁর 'কবিকথা'য়

---

১ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন- প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১২৯

২ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ— রাণী চন্দ, পৃঃ ৫০

৩ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ- রাণী চন্দ, পৃঃ ৫৪

লিখছেন[১]—"একটি দৃশ্য প্রায়ই সবার চোখে পড়ত—হাত দুখানি পিছন দিকে, দেহ ঈষৎ সামনে ঝুঁকে আছে, পা অবধি আলখাল্লা—বাসন্তী নয় পলাশ রঙের, সাদা চুল, সাদা দাড়ি, চলেছেন কবি অঙ্গন পেরিয়ে—হয় উদয়ন থেকে শ্যামলীতে, না হয় শ্যামলী থেকে উদয়নে। মধ্যে কোথাও থামা নেই; গতিতে কোথাও বৈষম্য নেই—একটানা সোজা গন্তব্য তাঁর নিশানা।" নন্দগোপাল বাবু তাঁর 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' নামক পুস্তকে লিখেছেন[২]—"২৫শে বৈশাখের জন্মতিথি উপলক্ষে যখন তিনি আম্রকুঞ্জে আসতেন, তখন কোঁচানো গরদের ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবী পরে আসতেন, গলায় নিতেন ব্যাটিকের কাজ করা ধোয়া উড়ানি, পায়ে পরতেন কটকি চটি, অথবা ফুলদার নাগরা। ৭ই পৌষের উৎসবেও এই বেশে আসতেন।"

বসন্তোৎসব অনুষ্ঠান। কবি আবৃত্তি করছেন—

"হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন,"

কবির সেদিনকার অপরূপ বেশের বর্ণনা দিচ্ছেন শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়[৩]—"তাঁর অঙ্গে ছিল বাসন্তী রঙের দামী রেশমী ধুতি আর পাঞ্জাবী। মাথার উপরকার সাদা চুলগুলি পরিপাটী করে আঁচড়ানো। চোখে মুখে খুশির অপূর্ব দীপ্তি। যেন উৎসবের আনন্দ-ভরা তাঁর মন দেহের অঙ্গে অঙ্গে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিতে সুগভীর তন্ময়তা।"

---

১ কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর, পৃঃ ৩২

২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৬

৩ মানুষ রবীন্দ্রনাথ—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৯৯

শ্রীমতী রাণী চন্দ লিখছেন তাঁর 'গুরুদেব'-এ[১]—"গুরুদেব উৎসব-অনুষ্ঠানে গরদের ধুতি-পাঞ্জাবী পরতেন। পাজামা বা সিল্কের লুঙ্গি ব্যবহার করতেন বাইরে কোথাও গেলে। নয়তো সদাসর্বদা মোটা তু-সুতির লুঙ্গি আর ঢিলে হাতার পাঞ্জাবী পরতেন। কখনো থাকত গেরুয়া রঙের, কখনো থাকত সাদা ধবধবে। তার উপরে পরতেন লম্বা জোব্বা। বাইরে বের হওয়ার কালে ছুটো জোব্বা লাগাতেন, ভিতরের জোব্বা বুক-ঢাকা, পুরাতন কুর্তার মতো বুকের উপরে আড়াআড়ি করে কোমরে বোতাম আঁটা। আর উপরেরটি গলা হতে পা পর্যন্ত সামনের দিকে সবটাই খোলা, যেন গায়ে আলগা হয়ে ঝুলতে থাকত জোব্বাটা। নানা রঙের জোব্বা ছিল গুরুদেবের। কালো, ঘননীল, খয়েরী, বাদামী, কমলা, গেরুয়া, বাসন্তী, মেঘ-ছাই-সিল্কের সূতোর। যখন যেটি পরতেন মনে হত এইটিই যেন বেশী মানালো তাঁকে। দিনে দিনে, মাসে মাসে রঙ বদলে বদলে সাজতে তিনি ভালোবাসতেন। কখনো নতুন সাজে সেজে বসে আছেন, ঘরে ঢুকে দেখে আপনা আপনি মুখ হতে বেরিয়ে আসত, বাঃ! গুরুদেব খুশির হাসি হাসতেন। শীত সবে যাব-যাব করছে, এক বিকেলে দেখি গুরুদেব বাসন্তী রঙের জোব্বা পরে বাইরে বসে আছেন। বেলা-শেষের আলো পড়ে সে রঙ যেন জ্বলে উঠলো।... 'বলি, এই সময়ে এই সাজ যে?'...বললেন, 'বসন্তের আসার সময় হল যে, আমি যদি তাকে ডেকে না আনি কে আনবে বল? তাই তো বাসন্তী রঙে সেজে বসন্তকে আহ্বান করছি। দেখলি নে, একটু আগে

---

১ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ৪২-৪৩

এক পলকের জন্য দখিন-হাওয়া পরশ বুলিয়ে গেল। লিখছিলাম, উঠে জোব্বা বদলে নিলাম।'

"সে-দিন সেই শেষ বেলায় কী অপরূপ রূপই দেখেছিলাম তাঁর!"

রবীন্দ্রনাথ একরকম টুপি ব্যবহার করতেন। দেখতে অনেকটা মুসলমানদের টুপির মতো। এই টুপি সম্পর্কে শ্রীমতী রাণী চন্দ লিখছেন[১]—"গুরুদেবের টুপি ছিল নতুন ধরনের। সুতির বা ভেলভেটের বা ঘন রঙের মোটা সিল্কের টুপি পরতেন তিনি। সে টুপি অন্য কারো টুপির সঙ্গে মেলে না। একেবারে আলাদা। আকারে অনেক বড়ো, নরম। মাথায় পরলে উপরের অংশটা আপনা হতে নানান্ ভাঁজে নেমে পড়ত। বড়ো সুন্দর লাগত দেখতে। সে টুপি যেন একমাত্র গুরুদেবকেই মানাত। তিনি অনেকবার অনেক রকম করে তৈরি করার পর এ টুপির আবিষ্কার করেছিলেন।"

১ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ৪২

আহার-বৈচিত্র্য

রবীন্দ্রনাথ তখন খড়দহে। একদিন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। নানা কথার মধ্যে কবি তাঁকে বললেন[১]—"আমি খুব ভোগী—লোকের এমন একটা ধারণা আছে। কথাটা সত্যি নয়, ছেলেবেলা থেকে যেভাবে মানুষ হয়েছিলুম তাতে ভোগের স্থান ছিল না। আমার মতো কৃচ্ছ্রসাধনও বুঝি কেউ করে নি। দিনের পর দিন শুধু মুগের ডালের সুরুয়া খেয়ে কাটিয়েছি।" কবির চিঠিপত্র পড়লে মনে হয় তাঁর এই উক্তি অতিরঞ্জিত। যেসব ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর প্রাত্যহিক খাদ্য-তালিকায় তাতে এ ধারণা সহজেই হতে পারে যে তিনি ভোজন-বিলাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর একান্ত নিকটে যাঁরা থাকতেন তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় কবি অত্যন্ত মিতাহারী ছিলেন। হয়তো বলা যায় তিনি ভোজ্য-বিলাসী ছিলেন। কবি নিজেও একথা কোনো কোনা জায়গায় উল্লেখ করেছেন। হরেক রকমের ভোজ্যদ্রব্য সাজিয়ে দেওয়া হত এই পর্যন্ত, কবি এ থেকে একটু ও থেকে একটু তুলে নিতেন মাত্র। আহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত ছিল না। আমিষ চাইতে নিরামিষ আহারই তিনি বেশি পছন্দ করতেন। রন্ধন-বিদ্যায় নিজের পারদর্শিতা সম্পর্কে তিনি অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। কবির নানা খেয়ালের মধ্যে এটাও একটা খেয়াল বলেই ধরে নেওয়া যায়।

---

১ আত্মস্মৃতি, ২য়—সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২০০

১৮৯৪ সাল। কবি আছেন জমিদারি সাহাজাদপুরে। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে একখানা চিঠিতে লিখছেন[১]—"দুপুরবেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক আর কিছু নেই।"

কবি প্রথম জীবনে মাংস খেতেন, পদ্মায় বোটে থাকবার সময় সঙ্গে মুরগী থাকত বাবুর্চিখানার নৌকায়। একদিন একটা মুরগী কি ভাবে ছাড়া পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে। হৈ হৈ করে লোকজনে সেটাকে ধরে নিয়ে এল। কবি লিখছেন[২]—"আমি ফটিককে ডেকে বললুম—আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। ... আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না। আমরা যে কী অন্যায় এবং নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখিনে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। ...আমি তো মনে করেছি, আরো একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।" "আরো" শব্দটার অর্থ হয়তো এই হতে পারে যে কবি ইতিপূর্বেও মাংস খাওয়া ত্যাগ করে নিরামিষ ধরেছিলেন। ১৮৯১ সাল। কবি তখন জমিদারি সাহাজাদপুরে। কি কারণে জানা যায় না, তিনি সম্ভবতঃ এসময় ভাত খেতেন না। মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন[৩]—"আমার আহার দেখে এখানকার লোকে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে। আমি ভাত খাইনে শুনে এরা মনে করে যেন আমি অনাহারে তপস্যা করচি। আটার রুটি যে ভাতের চতুর্গুণ খাদ্য তা এদের কিছুতেই ধারণা হয় না। ... সাহাজাদপুরময় কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ভাত ছেড়ে দিয়েছি বলে সবাই আমাকে ভারি ধার্মিক মনে করে— ...।" ফলের মধ্যে আমই

১ ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ, পত্রসংখ্যা ১১৯, তারিখ—৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

২ ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ, পত্রসংখ্যা ১০১, তারিখ—২২ মার্চ, ১৮৯৩

৩ চিঠিপত্র ১—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩

ছিল তাঁর প্রিয়। উক্ত চিঠিতেই লিখছেন—"আমার আম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবারে মনে হল যেন দু-জাতের আম ছিল। এক রকমের আম খুব ভাল ছিল—অন্যটাও মন্দ নয় কিন্তু তেমনি ভাল না। দুটো-একটা পচেও গেছে।" এর প্রায় দশ বছর পর—১৯০১ সাল, কবি তখন শিলাইদহে জমিদারিতে। মৃণালিনী দেবীকে আমের জন্যে তাগিদ দিচ্ছেন[১]—"আমার আম ফুরিয়ে এসেছে। কিছু আম না পাঠিয়ে দিলে অসুবিধা হবে।" এই চিঠিতেই তাঁর দৈনন্দিন খাওয়ার একটা বিবরণ দিচ্ছেন—"সকালে ঠিক সময়েই দুটি আম খাই, দুপুরবেলায় অন্ন, বিকেলেও দুটি আম এবং রাত্রে গরম লুচি ও ভাজা—"। কবির শেষ জন্মদিনে নানাবিধ উপহার এসেছিল। এ সম্পর্কে প্রতিমা দেবী লিখেছেন[২]—"...ফলে-ফুলে ঘর ভরতি হয়ে গেল, বিশেষ করে আমের সাজিতে; এই ফলটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। গত বৎসরেও দিনে ছ-সাতটা করে আম খেতেন, এবার এত ভক্ত তাঁকে আম পাঠাচ্ছেন কত দেশ-দেশান্তর থেকে, কিন্তু খাবার স্পৃহা চলে গেছে ...।"

হেমন্তবালা দেবী কবির খুব ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি কিছু আম কবিকে পাঠান। কবি তাঁকে লিখছেন[৩]—"আমের প্রতি আমার প্রবল লোভ। ...এই ফলের অর্ঘ্যযোগে তোমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেবা আমাকে আনন্দ দিয়েচে। এই পর্যন্ত যেই লিখেচি সেই মুহূর্তেই আমার সেবক তোমার দানের ডালি থেকে

১ চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৩-৫৪

২ নির্বাণ—প্রতিমা দেবী, পৃঃ ৩৩

৩ চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০-৮১ শক), ৯ আষাঢ়, ১৩৩৮

কয়েকটি ফল একটি পাত্রে সাজিয়ে আমার সামনে ধরল। ...ফল-ভোগ সমাধা হল আমার।"

আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ আহারই কবি বেশি পছন্দ করতেন। এমন সময় গিয়েছে যে তিনি সম্পূর্ণ ই নিরামিষাশী, যেমন শান্তি-নিকেতনের প্রথম দিকে—যখন এর নাম ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কেবল নিজেরাই যে নিরামিষাশী ছিলেন তাই নয়, আশ্রমের সকলেই। এ সম্পর্কে কবি-পত্নীর একখানা চিঠি[১] উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"আমাদের এখানে (শান্তিনিকেতনে) খাবার বন্দোবস্ত তো জানই, মাছ-মাংস খাবার যো নেই,—এরকম অবস্থায় এরকম সব উপহার পেলে কি রকম খুশী হবার কথা সে বলা বাহুল্য।" ১৯০১ সাল, কবি চলেছেন শিলাইদহে জমিদারিতে। পথে কুষ্টিয়া, সেখান থেকে মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন[২]—"আজ খাওয়াটা বড় গুরুতর হয়েছে, তোমার মা কোনোমতেই ছাড়লেন না—অনেকদিন পরে পীড়াপীড়ি করে মাছের ঝোল খাইয়ে দিলেন। মুখে কিন্তু তার স্বাদ আদপে ভাল লাগল না।" পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কথায়[৩] "আসলে মন থেকে তাঁর ইচ্ছা হত নিরামিষ-আহারী হতে, কিন্তু নিরামিষ খাওয়া তাঁর অভিমত হলেও, আমিষ খেলে থাকতেন ভাল।" ১৯৪০ সাল, কবি গেছেন কালিম্পং। শরীর অসুস্থ। সেই সময়কার কথা প্রতিমা দেবী লিখেছেন[৪] —"আজকাল

---

১ চিঠিপত্র ১—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭৩—কবির ভাগিনেয়ী সুপ্রভা দেবীর স্বামী সুকুমার হালদারকে লেখা

২ চিঠিপত্র ১—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫৮

৩ নির্বাণ—প্রতিমা দেবী, পৃঃ ৯

৪ নির্বাণ—প্রতিমা দেবী, পৃঃ ৮

ডাক্তারের পরামর্শে আবার মাছ-মাংস ধরেছেন, কলকাতায় অমিতা নাত-বউয়ের হাতের মাংস-রান্না অনেক দিন পরে মুখে ভালো লেগেছিল, বারবার বললেন—তাই পাঁঠার মাংসের ঝোল সেদিন রান্না হল।...সুধাকান্ত বললে—'আজ বৌদি পাঁঠার মাংস রেঁধেছেন, খেয়ে দেখুন।' তিনি (কবি) হেসে বললেন—'নাত-বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত হবে'।" কবির খাওয়া চলত তাঁর খেয়ালমত। কখনও আমিষ, কখনও নিরামিষ। প্রতিমা দেবী বলছেন[১]—"সুস্থ অবস্থায় বাবামহাশয় কখনো এক রান্না দুদিনের বেশি খেতেন না। নিত্য-নতুন রান্না হলে তিনি ভারি খুশি হতেন, তাছাড়া নিজেও নানাপ্রকারের রন্ধন-তালিকা আমাদের বলতেন, সেই তালিকা অনুসারে রান্না উতরে গেলে তাঁর স্ফূর্তি হত। অনেক সময় হেসে বলতেন—'বউমা, তোমার শ্বাশুড়ীকে আমি কত রান্নার মেনু জোগাতুম, আমি অনেক রান্না তাঁকে শিখিয়েছিলুম, তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি'।" মংপুতে থাকাকালে একদিন মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন—"রান্নার অনেক পরীক্ষা করতুম একসময়ে, ফল মন্দ হত না'।" এ সম্পর্কে আর একদিন বলছেন[২]—"সামন মাছের কচুরি বানাও না, সে রীতিমত ভাল হয়। আমি মেজদার ওখানে ছিলুম তখন বৌ-ঠাকুরণকে দিয়ে নানা experiment করিয়েছি। তাছাড়া রথীর মার কাছে তো একটা বড় খাতা ছিল আমার রান্নার,...। টিনের মাছের কচুরি আর জ্যামের প্যারাকী, সে সব মন্দ খাদ্য নয়। তোমার অতিথিদের যদি একবার এসবের স্বাদ দেখাও তাহ'লে আর তারা নড়তে চাইবে না।" কবির

১ নির্বাণ—প্রতিমা দেবী, পৃঃ ৯

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ২৩৬

আহার-বৈচিত্র্য সত্যই লক্ষণীয়। একবার প্রতিমা দেবীকে তাঁর দৈনন্দিন আহারের একটা তালিকা পাঠাচ্ছেন[১]—"বৌমা,... ভোরে তিনটের সময় উঠে স্নান করি, মাথায় গায়ে সরষে-বাটা মেখে। আলো যখন হয় চায়ের সরঞ্জাম আসে—মস্ত একডালা মাখন খাই চিনিসহযোগে—চীনে চায়ের সঙ্গে থাকে ছুতোসরুটি—টেবিলে যোগ দেয় সুধাকান্ত এবং সেক্রেটারি—তাঁদের জন্যে রুটি ছাড়া থাকে সুনন্দা কোম্পানির রচিত মিষ্টান্ন—সেটাতে আমার অতিথিদের যথেষ্ট উৎসাহ দেখতে পাইনে,—নিশ্চয় সকালে তাঁদের যথেষ্ট ক্ষিদে থাকে না। বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার মাধ্যভোজন—একেবারে বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন—আতপ-চালের সফেন ভাত, আলুসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ, কোনো কোনো দিন অতি-সভয়ে খেয়ে থাকি তোমারই বাগানে উৎপন্ন ওলসিদ্ধ। সঙ্গে থাকে এক পাইণ্ট ঘোল। তিনটের সময় বাগানের আতা ও আঙুরের রস। ৬টার সময় ভূষিসমেত আটার দুইখণ্ড রুটি সিদ্ধ আলু ভাজা সংযোগে, এক পেয়ালা দুধে কিঞ্চিৎ ফলের রস মিশিয়ে। এর অতিরিক্ত যা আসে সে আসে ঠাকুরের নৈবেদ্যরূপে, ঠাকুরের প্রসাদ-রূপে, সে যায় অন্যের ভোগে।" মেনুর বহর দেখে অনেকে হয়তো তাঁর খাওয়ার পরিমাণ-সম্পর্কে ভুল করতে পারেন। খেতেন তিনি খুবই কম। জীবনে পথ্যবিজ্ঞান নিয়ে অনেক পরীক্ষা তিনি করেছেন। কারণ আর কিছুই নয়, একঘেয়েমি বদলানো, বৈচিত্র্য আনা। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন[২]—"কখনো ঠিক করলেন, সব জিনিস সিদ্ধ খাবেন, ডাল, তরি-তরকারি, শাক-সবজি,

---

১ নির্বাণ—প্রতিমা দেবী, ২২শে অক্টোবর, ১৯৩৫ পৃঃ ৯-১০

২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১১৫

সব সিদ্ধ খেতে আরম্ভ করলেন—শরীরে সহ্য হল না, অনিচ্ছার সঙ্গেই বদলালেন। বললেন, কাঁচা ফলমূল নিয়ে পরখ করতে হবে—শুরু হল কাঁচা খাওয়া, সম্ভব-অসম্ভব নানা উদ্ভিজ্জ বস্তুর ওপরই পরখ চলল। আবার সেটা বদল হল, তার জায়গায় এল যবের ছাতু, আখের গুড়, কলা, দই ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা।" মংপুতে আছেন, শখ হল ছাতু খাওয়ার। মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন[১]—"আচ্ছা তোমরা ছাতু খাও না কেন? ছাতু জিনিসটা ভাল, আর তেমন করে মাখতে পারলে অতি উপাদেয় ব্যাপার হয়। একসময় ভাল ছাতু-মাখিয়ে বলে আমার নাম ছিল, মেজদার টেবিলে ছাতু মাখতুম মারমালেড দিয়ে।" "মারমালেড দিয়ে ছাতু?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মৈত্রেয়ী দেবী। "নয় তো কি? অতি উপাদেয় সুখাদ্য। আনাও না ছাতু।"—জবাব দিলেন কবি। যবের ছাতু পাওয়া গেল না। অভাবে এল মুড়ির ছাতু। ওতেই চলবে। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন—"মারমালেড এল, গোল্ডেন সিরাপ এল, আদার রস, দুধ, কলা, মাখন প্রভৃতি যেখানে যা আছে সব ছাতুর উপর পড়তে লাগল, আর মাখা চলল আধঘণ্টা ধরে।" সন্ধ্যেবেলা সকলে বসলেন। প্লেটে করে ছাতু সাজিয়ে দেওয়া হল, কবি জিজ্ঞাসা করলেন—"কি রকম?" ভাল যে লেগেছে তা নয়, পাছে কবি অসন্তুষ্ট হন এই আশঙ্কায় মৈত্রেয়ী দেবী বললেন—"খুব চমৎকার, এ তো রোজ খেলেই হয়।" কবির অন্যতম ভক্ত ও সহচর সুধীরচন্দ্র কর মহাশয় তাঁর 'কবিকথা'য়[২] লিখছেন—"খাওয়াদাওয়ায় কবির নিরামিষে ছিল ঝোঁক। আমিষও তিনি

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ২৫৭

২ কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর, পৃঃ ১৬-১৭

গ্রহণ করতেন। ডাক্তারি-ব্যবস্থাকে মানতেন আগে। মাংস ও ভাতের মিশোলো—তৈরী জাওয়ের মতো খাদ্য শেষদিকে কিছু দিন ছিল তাঁর জন্য চিকিৎসকদের কড়া ব্যবস্থা। ভালবাসতেন মিষ্টান্ন। নানা প্রচুর ফলের সমাবেশ থাকত চায়ের সঙ্গে। তার মধ্যে পেঁপে খেতেন নিয়মিত। তাঁর মধ্যাহ্ন আহারে ভাত ও সন্ধ্যার আহারে ছিল লুচি বরাদ্দ। বেলা দশটায় সাধারণত লেখার টেবিল ছেড়ে যেতেন স্নানে, সাড়ে এগারোটা-বারোটার মধ্যে আহার শেষ হত। শ্বেতপাথরের দশ-বারোটি ছোট ছোট বাটিতে ও থালায় ভাত ও নানারকম ভাজাভুজি, ছোকা, ডাল, তরকারি, ঝোল ইত্যাদি থাকত সাজানো। দু'একচামচ করে এবাটি ওবাটি থেকে একটু একটু তুলে নিয়ে গল্প করতে করতে খেতেন। সবশেষে একটু দই ও পায়েস নিতেন।" আশ্রমের অন্যান্য বাড়ী থেকেও কবির জন্যে মাঝে মাঝে নানাবিধ খাবার আসত। আনন্দের সঙ্গে কবি সেগুলো গ্রহণ করতেন। এমনও হয়েছে নিজের বাড়ীর খাবার সরিয়ে রেখে তিনি অন্য বাড়ীর খাবার খেয়েছেন। ফলের মধ্যে আম এবং উষ্ণ পানীয়ের মধ্যে কফি কবির প্রিয় ছিল। সুধীরচন্দ্র লিখেছেন[১]—"কবি সকালে ছ-টার মধ্যে খেতেন কফি। বেলা ন-টার মধ্যে একগ্লাস ফলের শরবত, বারোটার মধ্যে ভাত, অপরাহ্ণ দুটায় চা এবং সন্ধ্যা ছ-টা থেকে সাতটার মধ্যে ছিল নৈশ-ভোজনের পালা।" একবার খেয়াল হল সকালে চায়ের টেবিলে অন্য জিনিসের পরিবর্তে পান্তাভাত খাওয়ার। খরচ কম, পুষ্টিকর এবং স্নিগ্ধ। বীরভূমের মত গরম জায়গার পক্ষে বেশ উপযোগী। লেবু ও লবণ মিশিয়ে কয়েকদিন এই পান্তাভাত খাওয়াও চলেছিল।

১ কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর, পৃঃ ১৯

রবীন্দ্রনাথের বৈকালিক চায়ের টেবিলের বর্ণনা দিচ্ছেন প্রমথনাথ বিশী[১]—নানারকম ফল ও মিষ্টিতে টেবিল ভরা থাকিত ; তিনি সামান্যই খাইতেন, কিন্তু টেবিলে ষোড়শোপচারে সাজাইয়া রাখিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার নিয়ম।" নিমের পাতা-সিদ্ধ জল, নিমপাতা বাটা কবি খেতেন মাঝে মাঝে। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ও ঠিক এইরকম বর্ণনাই দিয়েছেন[২]—"নানা জিনিস সাজিয়ে দেওয়া হত তাঁর টেবিলে—এটা থেকে কিছু, ওটা থেকে কিছু চামচ দিয়ে তুলে তুলে নিতেন। কোনটাই ষোল আনা খেতেন না, বা আহার ব্যাপারে আমাদের যা প্রচলিত রীতি, তাও বড় একটা অনুসরণ করতেন না। হামেশাই দেখেছি—হয়ত গোড়াতেই খেলেন খানিকটা পায়েস, তারপর খেলেন দুচারখানি আলুভাজা, নয়ত একটু মোচার ঘণ্ট—তারপর হয়ত দুটি দই-ভাত এবং অবশেষে হয়ত দুখানা লুচি ও একটু ঝোল।" নির্মলকুমারী মহলানবীশ লিখেছেন[৩]—"শান্তিনিকেতনে ভোরবেলা নিজে যখন বাগানের ভিতর অথবা বাড়ির সামনে খোলা চাতালে চা খেতে বসতেন, তখন ওঁর চারপাশে পাখিদেরও একটা ভোজ সুরু হত। নিজে বেশির ভাগ সময়ই হয় মুড়ি নয় কলবেরোনো ভিজে মুগ বা ছোলা খেতেন, সামান্য একটু আদার কুচি কি গুড় দিয়ে। রুটি মাখন চলত।"

আগেই বলেছি উষ্ণ পানীয়ের মধ্যে কফিই ছিল তাঁর প্রিয়। অবশ্য কফির পরিমাণ থাকত নামমাত্র, দুধই বেশী। ১৯৪০ সাল।

---

১ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১৪৩
২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৭
৩ বাইশে শ্রাবণ—নির্মলকুমারী মহলানবীশ, পৃঃ ৪৩

স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। একদিন দুপুরে রাণী চন্দকে বলছেন[১]—“দুটো বাজল—এবারে একটু কফি খেয়ে কাজে লাগি। …এই সময়ে একটু কফি খাই, শুধু দুধ খাবার জন্য। একটুখানি কফিতে যতটা পারি দুধ ঢেলে দিই। মহাত্মাজির কাছে কথা দিয়েছি ঘুমোব, আর বৌমার কাছে কথা দিয়েছি কফি খাব। কিন্তু মজা দেখ কফি খেলে ঘুম আসে না। আর ঘুমুতে গেলেও কফি খাওয়া চলে না। দুটো ঠিক বিপরীত।”

খাদ্যবস্তু নিয়ে কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। নন্দগোপালবাবু বলেন[২]—“হঠাৎ ঠিক করলেন, সব জিনিস সিদ্ধ খাবেন--চললো কিছুকাল সিদ্ধ খাওয়া—পেঁপেসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ, মূলো-গাজর-কপিসিদ্ধ। হঠাৎ মনে করলেন, কাঁচা আনাজ খাওয়া ধরবেন—অমনি সুরু হল কাঁচা খাওয়া—টম্যাটো, মূলো, শালগম, নানা জিনিস খেলেন কিছুদিন। হয়তো—শরীরে সইল না, দুচার দিন পরে ছেড়ে দিলেন।…একবারকার কথা বলছি। …শুধু শুকনো খাবার (যথা—ছাতু, রুটি, খই, মুড়ি ইত্যাদি) খাচ্ছেন কবি। ফলে পাকস্থলী উত্তেজিত হয়েছে…। তাঁকে বারবার অনুরোধ করা হল খাদ্যতালিকা পরিবর্তন করতে। বললেন, ‘বেশ তাই হবে। কিন্তু এতে প্রমাণ হল না যে পন্থাটা ভুল—আমার দেহযন্ত্রে বরদাস্ত হল না এই পর্যন্ত বলতে পারি।” কবি একদিন বলেছিলেন—‘জানো সবরকম কলার মত রন্ধনকলাতেও আমার নৈপুণ্য ছিল। একদা মোড়া নিয়ে রান্নাঘরে বসতাম এবং স্ত্রীকে নানাবিধ নূতন রান্না শেখাতাম।’ রাত্রের

১ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রাণী চন্দ, পৃঃ ৬৩

২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ – নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩০, ৩১, ৩২

আহার খুব কম ছিল। সাধারণত, গব্যজাতীয় জিনিস খেতেন যেমন—ছানা, দুধ, কিছু সন্দেশ, দু-একখানা লুচি বা অল্প একটু যবের ছাতু, সেই সঙ্গে কিছু ফলমূল। সকালে খেতেন সাধারণত কিছু ভাজাভুজি, যেমন—চিঁড়েভাজা, নয়তো মুড়ি, পাঁপরভাজা, নারকেল-নাড়ু বা অন্য মিষ্টান্ন,—ফলের মধ্যে পেঁপে বা আম বা অন্য ফল। পেঁপে শুনা যায় রোজই খেতেন। পানীয় হিসাবে চা, নয়তো কফি কিংবা কোকো। চা খেতেন কম। কোকোও তাই। পছন্দ করতেন কফি। একটু পরে খেতেন এক গ্লাস শরবত—কোন-না-কোন ফলের নির্যাস থেকে বানানো। এর জন্যে আম, কলা, নেবু, রকমারি ফল ব্যবহৃত হোতো। বেশির ভাগই কমলানেবু। বিকালে ৪টা নাগাদ ফলই খেতেন বেশী—সঙ্গে একটা উষ্ণ পানীয়। ফলের মধ্যে আমই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, তারপরই কমলা।"

কবি জীবনে যত চিঠি লিখেছেন নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা চিঠির সংখ্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। এইসব চিঠির অনেকগুলোর মধ্যেই তাঁর খাওয়ার একটা বিবরণ পাওয়া যায়। একখানা চিঠিতে লিখছেন[১]—"...এইমাত্র মধ্যাহ্ন-ভোজন সাঙ্গ হোলো, ছিল ঘি-ভাত, শুক্‌তো, লাউ-সহযোগে মুগের ডাল, মাগুর মাছের ঝোল, আলুর চপ, ছাঁচিকুমড়ার পায়স এবং দিলখোশ নামক একটা নূতন আমদানি মিষ্টান্ন। এইটে তোমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী-রচিত শোনপাঁপড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যোগ্য।" এ থেকে মনে হয় নির্মলকুমারী মহলানবীশ ভাল শোনপাঁপড়ী

---

১ ২৬০নং চিঠি, ২০শে মার্চ, ১৯৩৪

পত্রগুলি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

তৈরি করতে পারতেন এবং কবিও সেটা পছন্দ করতেন। খাদ্যদ্রব্য উপহার পেলে কবি খুশী হতেন। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখছেন[১]—"...চিঠি পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে ফিরতি খাদ্যবাহন-যোগে মিষ্টান্ন এসেও পৌঁছল। প্রথমোক্তটা বিনামূল্যে, শেষোক্তটা প্রত্যুত্তর।"

একবার অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ এসেছেন শান্তিনিকেতন। যাওয়ার সময় কবিকে তাঁদের বরানগরের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। সেই প্রসঙ্গে কৌতুকপ্রিয় কবি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখছেন[২]—"প্রশান্ত এসেছিল, ক্ষণিকের অতিথি চলে গেছে—জানিয়ে গেছে বরানগরে আমার নিমন্ত্রণের কথা। ছানা, ছাতু, ছোলা ইত্যাদি শ্রেণীর পথ্যে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু অন্য উপকরণের অভাব আছে এই কারণে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করচি নে। প্রয়োজনীয় জিনিসের দৈন্য সহ্য হয়, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের অসচ্ছলতা শোচনীয়।" এই চিঠির ঠিক বারো দিন আগে (১৮ই আষাঢ়) লেখা একখানা চিঠি থেকে বুঝা যায় নির্মলকুমারী মহলানবীশ তখন দার্জিলিং-এ। সুতরাং বরানগরের বাড়ীতে তাঁর অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করেই হয়তো কবির এই পরিহাস।

কবির মধ্যাহ্নভোজনের কথা তাঁর লেখা অনেক চিঠির মধ্যেই পাওয়া যায়—"আমার মধ্যাহ্নভোজন আজকাল পূর্বাহ্নেই হয়। অর্থাৎ সাড়ে নটায়। আজ কিঞ্চিৎ ডিমপোচ রুটিমাখন ও দই খেয়েচি।"[৩]

১ চিঠি—রবীন্দ্রনাথ, ৭ই মার্চ, ১৯৩৪

২ ২৩৮নং চিঠি, তাং ১লা শ্রাবণ, ১৩৪০

৩ ২৩৯নং চিঠি, তাং ২৩শে জুলাই, ১৯৩৩

প্রাতরাশ সম্পর্কে লিখছেন[১]—"এলো চায়ের পাত্র, তার থেকে এই সজল পবনে নিঃশ্বসিত হয়ে উঠচে দূরে দার্জিলিংএর সুগন্ধ আভাস—আর এল পীচ কলা আঙুরগুচ্ছ, তার সঙ্গে দুটি সন্দেশের গুটিকা (নবীন অথবা দ্বারিক ময়রার কীর্তি), দুটি নারকেলের বরফি—নেত্রকোণা তটের আতিথ্যের উত্তরাকাণ্ড।" অধ্যাপক মহলানবীশের বরানগরের বাড়ীর নাম 'শশী ভিলা'। কবি মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে এসে থাকতেন। বাড়ীর পূব-দক্ষিণের কোণের একখানা ঘর। দক্ষিণে পুকুর, পূবে বাগান—পুকুর, সবুজ মাঠ, মরশুমি ফুলের কেয়ারি, সুপুরিগাছের সারি, কিছু অংশ এই ঘরখানা থেকে দেখতে পেতেন—তাই নাম দিয়েছিলেন 'নেত্রকোণা'। এখানে যে বরফির উল্লেখ রয়েছে মনে হয় নির্মলকুমারী মহলানবীশের বাড়ী থেকে এসেছিল এবং তারই কিছু অবশিষ্ট সেদিন কবিকে দেওয়া হয়েছিল।

"এইমাত্র খেয়ে উঠলুম, একটা আম, গোটাকতক লিচু, টোস্ট-করা রুটি, পাহাড়ী গোষ্ঠের মাখনে আর পাহাড়ী মৌচাকের মধুতে লিপ্ত।"—লিখেছেন নির্মলকুমারী মহলানবীশকে একখানা চিঠিতে।[২] পরে আর একখানা চিঠিতে[৩] লিখছেন—"...বর্ধমানে পৌঁছিয়ে

১ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩
পত্রগুলি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

২ ৪২৮নং চিঠি, তাং ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

৩ ৪৩৬নং চিঠি, তাং ৪. ৭. ৩৮
পত্রগুলি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

এক পেয়ালা চা আর দুটো ডিম খেয়ে মনে হল আরো হয়তো কিছুদিন বাঁচব।"

উত্তরবঙ্গের চাপড় ঘণ্ট ও বেতের স্থক্তনি খুব বিখ্যাত। হেমন্তবালা দেবী কবিকে বোধহয় কিছু লিখে থাকবেন, যার উত্তরে কবি লিখছেন[১]—"তোমাদের উত্তরবঙ্গের চাপড় ঘণ্ট এবং বেতের স্থক্তনি আমার রুচির পক্ষে বেশি তীব্র; তাদের সম্বন্ধে আমার রসনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু নাম শুনলে গুরুমশায়ের পাঠশালা মনে পড়ে।" পূর্বকালে পাঠশালায় গুরুমশায়দের কাছ থেকে ছাত্রদের ভাগ্যে প্রচুর চড়চাপড় ও বেত জুটত। কবি পরিহাস করে তারই ইঙ্গিত করেছেন এখানে। হেমন্তবালা দেবীকে আর একখানা চিঠিতে লিখছেন[২]—"তোমার পত্রে যে বাচিক ভোজ দিয়েচ সেটা উপাদেয় বলে মনে হোল। ··· বহুদিন পূর্বে একদিন নাটোরের মহারাজ পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা ছিল প্রতিদিন তাঁকে একটা কিছু সম্পূর্ণ নতুন জিনিস খাওয়াব। মীরার মা ছিলেন এই চক্রান্তের মধ্যে—তিনি খুব ভাল রাঁধতে পারতেন, কিন্তু নতুন খাদ্য-উদ্ভাবনের ভার নিয়েছিলুম আমি। সেই সকল অপূর্ব ভোজ্যের বিবরণসহ তালিকা আমার স্ত্রীর খাতায় ছিল। সেই খাতা আমার বড় মেয়ের হাতে পড়ে। এখন তারা দুজনেই অন্তর্হিত। আমার একটা মহৎ কীর্তি বিলুপ্ত হোল। রূপকার রবীন্দ্রনাথের নাম টিকতেও

---

১ চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০-৮১ শক), ২ই আষাঢ়, ১৩৩৮

২ চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০ ৮১ শক), ৫ই নভেম্বর, ১৯৩১

পারে, সূপকার রবীন্দ্রনাথকে কেউ জানবে না।" পরের চিঠিতে লিখছেন[১]—"আমার এখানে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী নামে একটি ভদ্রলোক আছে, রন্ধন-ব্যাপারেই তার সবচেয়ে উৎসাহ। তোমার পূর্বপত্রের এক অংশ শুনে তার ঔৎসুক্য প্রবল হয়েছিল। তোমার এবারকার চিঠির ত্রয়োদশপদী মোচার ঘণ্টের তালিকা দেখিয়ে তার উল্লাস বর্ধন করব এই আমার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু সেটা মীরা নিয়ে গেল বলপূর্বক, তারও রাঁধবার শক্তিও আছে আনুরাগও আছে।"

হেমন্তবালা দেবীকে আর একখানা চিঠিতে লিখছেন[২]—"তোমার পিঠে-রচনাপ্রণালীর তালিকা বৌমাকে দিয়েছি—আশা করি দেওয়াটা সার্থক হবে, ইতিমধ্যে প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে রবিঠাকুর পিঠের নৈবেদ্য মাঝে মাঝে পেয়েছেন।" এর পরের চিঠি[৩]—"তোমার চিঠিতে যখন তুমি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণা কর, তখন বুঝতে পারি সেটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার শিক্ষা আমার হয় নি, কিন্তু তোমার পিঠে প্রস্তুতের প্রকরণ পড়লে পরীক্ষার পূর্বেই বুঝতে পারি সেগুলি শ্রদ্ধার যোগ্য। এমন কি বৌমা তোমার রচিত পৈষ্টকী সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন—শাস্ত্র অনুসারে তোমার এই লেখাগুলিকে কাব্য

---

১ চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০-৮১ শক), ৫ই নভেম্বর, ১৯৩৩
পত্রগুলি হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত এবং বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত।

২ চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮৮০-৮১ শক), তারিখ—মাঘ ১৩৪০

৩ চিঠিপত্র (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮৮০-৮১ শক), তারিখ—১৩ মাঘ, ১৩৪০

বলা যেতে পারে, কেননা সাহিত্যদর্পণ বলেচেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।”

হেমন্তবালা দেবীকে কবি তাঁর ‘সমস্ত দিনের ভোজনের তালিকা’ পাঠাচ্ছেন[১], “প্রাতে ৬টা :—মাখন দিয়ে তোস্-করা রুটি দুই খণ্ড। তৎসহযোগে বিলিতি বেগুনের জ্যাম, গৃহজাত। অনেক পরিমাণে দুগ্ধ সংযোগে—চৈনিক চা, দুটি কদলী। বেগুনটা বিলিতি, তথাপি নিরামিষ। মধ্যাহ্নে :—পালং, রাইসর্ষের শাক, ফুলকোফি, সেলারি (একপ্রকার বিলিতি সবজি), ধ্যাঁড়স—সমস্তই কাঁচা, খণ্ড খণ্ড করে মিশিয়ে তাতে আদা ও নেবুর রস দিয়ে তৎসহ পুদিনা শুল্ফ শাক মিশিয়ে কিঞ্চিৎ শর্করা যোগে সেবন করে থাকি, যেটাকে সেলারি বলচি এটা বিলিতি বটে কিন্তু দ্বিপদ বা চতুষ্পদ নয়, মাটি ফুঁড়ে ওঠে বটে কিন্তু শিং দিয়ে গুঁতিয়ে নয়। কালীঘাটে মানত করবার মতো এর মধ্যে ব্যথা, ভয় বা রক্তও কিছু নেই। তারপরে তোস রুটি, দুটো লবণ-স্পৃষ্ট, বাকি দুটো মিষ্টি প্রলেপ যুক্ত। ক্বচিৎ সন্দেশ দিয়ে সমাপণ করি। অপরাহ্নে :—ছাগদুগ্ধ সহযোগে চা। সায়াহ্নে :—পূর্বোক্তবৎ সবজির মিশ্রণ। পরিণামে যদেচ্ছাকৃত মিষ্টান্ন, সেটা মাছ বা মাংস দিয়ে রচিত নয়। প্রাতে মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে আধপোয়া আন্দাজ ছাগদুগ্ধ খেয়ে থাকি, কিন্তু তার পূর্বে জগন্মাতার প্রসাদী ছাগের পিতৃ বা ভ্রাতৃপুরুষকে ভক্ষণ করিনে।”

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন ১৩৩৪ সালে। তিনি লিখছেন[২]—“কবি আইসক্রীম খুব ভালবাসতেন। …ঠাণ্ডা

১ চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ—পৃঃ ২৭১, ২২শে জানুয়ারী ১৯৩৫

২ যুগান্তর, ২৫ বৈশাখ, ১৩৭০

লেগে তাঁর গলা ভাল ছিল না—একটা গান শুনবার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না, কিন্তু আইসক্রীম বাদ দেন নি—এ নিয়ে একচোট হাসাহাসি হয়ে গেল।" ঘটনাটি ঘটে বিকালে চা-পানের টেবিলে।

১৯০৩ সাল, জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী লেডি অবলা বসু তখন দার্জিলিংয়ে, যতদূর মনে হয় তিনি কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ীতে। উত্তরে কবি লিখছেন—"আপনি কেন আমাকে লোভ দেখাইতেছেন! দার্জিলিংয়ে আপনার ওখানে যাইতে পারিলে আমি আর কিছুই চাহিতাম না।···আপনার আশ্রয়ে যদি যাইতে পারিতাম তবে অধ্যাপক একদিকে আর এই সম্পাদক আর একদিকে নিঃশব্দে আপন কাজে লাগিয়া থাকিতাম—ক্ষুধার সময় আপনার কাছে গিয়া পড়িতাম—কিন্তু নিরামিষ, তাহা বলিতেছি—আর কইমাছ নয়—দ্বিপদ চতুষ্পদের তো কথাই নাই।" সম্প্রতি মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু হয়েছে, তার কিছুদিন পূর্বে স্ত্রীর মৃত্যু—মনে হয় এই সব কারণে কবি ঐ সময় নিরামিষাশী ছিলেন।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তখন শান্তিনিকেতনে। কবি একদিন তাঁর পদ্মাজীবনের কাহিনী বলছেন। সকালে উঠে চরে বেড়াতে যেতেন, বোটে ফিরে এলে চাকর ফটিক একবাটি ডালের সূপ এনে দিত, খেয়ে লিখতে বসতেন। প্রভাতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন[১]—"আপনার আহারটা কি ডালের সূপ দিয়েই হত?" উত্তরে কবি বলেন—"না, সাত্ত্বিকতার অহংকার করব না, তখন মাংস খাওয়া অভ্যাস ছিল, ফটিক সন্ধ্যার পর এনে দিত কাটলেট-জাতীয় খাদ্য লুচির সহযোগে।"

---

১ রবিচ্ছবি—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ ৭৪

হেমলতা দেবী লিখেছেন[১]—"কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার।...নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের কম শখ ছিল না কবিরও,...রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেকবার। শুধু ফরমাস করেই ক্ষান্ত হতেন না। নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি শখ মেটাতেন।...সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোক চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারতেন না।...কবি বহুবৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর...এমন কি সময় সময় অন্ন ত্যাগ করে, শুধু ছোলা ভেজানো, মুগ ডাল খেয়ে দিন কাটান ...।"

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় কিছুদিন কবি-সান্নিধ্যে ছিলেন। কবির খাওয়া সম্বন্ধে তিনি লিখছেন[২]—"রবীন্দ্রনাথ খাওয়া সম্বন্ধেও একান্ত সূক্ষ্মরুচির মানুষ।...তিনি খাওয়াকে শুধু খাওয়া মনে করেন না। তাঁর চোখে খাওয়া শুধু দেহপুষ্টির প্রাত্যহিক স্থূল প্রয়োজন নয়। আবার নিছক মনস্তুষ্টির বিলাসও নয়।... তিনি নিজে খেতে ভালবাসেন, বিদ্যাসাগরের মত অপরকে খাওয়াতেও ভালবাসেন।...এক তালিকা অনুযায়ী প্রতিদিন তাঁর খাবার তৈরী হয় না। দিনে দিনে মেনু বদলায় স্বাদে এবং প্রকারে। ...মিষ্টির মধ্যে সন্দেশ খেতে ভালবাসেন। সুবিধা থাকলে তাজা গুড় এবং চাকভাঙা মধু নিয়মিত খান। ...শীতকালের ভোরবেলা খেজুররস তাঁর প্রায় নিত্য-পানীয় ছিল। ...তিনি

১ সৃজনী—হেমলতা দেবী, পৃঃ ১৭৭

২ মানুষ রবীন্দ্রনাথ—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫-৪৮

ভাতে শুকনো নিমপাতা খেতেন। তাঁর তরকারিতে শুকনো নিমপাতার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হত। দুপুরের খাওয়া শুরু করার আগে একগ্লাস কাঁচা নিমপাতার শরবত ছিল তাঁর নৈমিত্তিক পানীয়।"

রাণী চন্দ বহুদিন কাটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, কবির খাওয়ার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন তিনি তাঁর লেখা 'গুরুদেব'-এ,[১]— "গুরুদেবকে হাতে খেতে দেখিনি কখনও, কাঁটা-চামচে খেতেন। অত্যন্ত মিতাহারী ছিলেন। সব মিলিয়ে দু-তিন চামচ পরিমাণ খাবার খেতেন। তাই বলে তাঁকে কম করে খাবার দেওয়া চলত না; অসন্তুষ্ট হতেন। থালায় বাটিতে নানা রকমের খাবার সাজিয়ে সামনে ধরা হত, তিনি বাটিগুলির ঢাকা খুলে আগে দেখতেন কি কি আছে। তারপর অমুকে মাংস ভালবাসে, তার বাড়িতে মাংসের বাটিটা গেল, অমুকে মাছ ভালবাসে তাকে মাছের বাটি পাঠালেন। এমনিতরো কারো জন্য চপ্‌টা, কারো জন্য পায়েসটা, কারো জন্য বড়ির ঝোল; এই করে প্রায় সবটাই বিলি হয়ে যেত। কাছে কেউ থাকলে তাকে সেখানে বসেই খাওয়াতেন, খাওয়াতে, খাওয়া দেখতে গুরুদেব খুব ভালবাসতেন। ... সকালে গুরুদেব চা-পাঁউরুটি-টোস্ট খেতেন, কোনোদিন বা একটা আধসেদ্ধ ডিম। আমের দিনে আম খেতেন, আম তিনি খুব ভালবাসতেন খেতে। দুপিঠ কেটে চামচে দিয়ে তুলে নিতেন মাঝখানটা। অন্য ফল কখনও খেতেন একটু-আধটু। গুরুদেবের চা খাওয়াটা ছিল বড় মজার। চা নামেই থাকত শুধু। কেটলিভরা গরম জলে কয়েকটা চা পাতা ফেলে দিতেন, জলে রং ধরত কি না ধরত, তারই আধপেয়ালা ঢেলে নিয়ে বাকিটা

১ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ৯৯

দুধ দিয়ে ভর্তি করে নিতেন ; দু'চামচ চিনি দিতেন ; এই হল তাঁর চা, চা-এর জন্যই যে খেতেন, তা নয়। গরম পানীয় একটা খেতে হবে তাই নামেমাত্র চা খেতেন। চীনে চা-ই পছন্দ করতেন তিনি। সে চা-ও শুকনো বেল, যূঁই এর।···বেলা নটা নাগাদ খেতেন এক-পেয়ালা স্যানাটোজেন কিংবা হরলিক্স কিংবা ঐজাতীয় কিছু পানীয় বস্তু। বেলা দশটা সাড়ে দশটায় স্নানের ঘরে যেতেন। এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাবার খেয়ে নিতেন। দুপুরে দিশী ধরনের রান্না হত, শ্বেতপাথরের থালা-বাটিতে খাবার সাজিয়ে আনা হত। খাবার শেষে এবেলায় একটু দই রোজই খেতেন। বিকেলে চা ; সঙ্গে নোন্তা মিষ্টি যা থাকত একটু হয়তো বা মুখে দিতেন কখনও, কখনও কিছুই খেতেন না, চা ছাড়া। রাত্রের রান্না বিলিতী মনে হত। সূপ, মাছ বা মাংস, পুডিং এই রকম ··· সন্ধ্যেরাত্রেই খেতেন তিনি। খাবার সম্বন্ধে কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ দেখিনি কখনও তাঁর। তবে চই সম্বন্ধে আগ্রহ দেখেছি।" যশোর জেলায় চই খাওয়ার প্রচলন বেশী। কবি ডাল দিয়ে চই খেতে ভালবাসতেন। একদিন এক পণ্ডিত-অতিথি এসে বলেন যে আমাদের দেশে হবিষ্যান্নই উপযুক্ত আহার। কবি মন দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনলেন। অতিথি চলে গেলে বললেন[১]—"ইনি যা বলে গেলেন ঠিক কথাই, আমাদের দেশ গরম দেশ। এদেশে দেহমন ঠিক রাখতে হবিষ্যান্নই একমাত্র আহার হওয়া উচিত। কাল থেকে আমাকে তাই দিও বউমা। আমি কিছুকাল থেকেই স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যা খাচ্ছি তা আমার দেহ ঠিকমত নিতে পারছে না। অথচ বুঝতে পারছিলাম না কি করা যেতে পারে।

১ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ১০৪

এবারে ঠিক আহার্য বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল।" হাট থেকে মাটির মালসা এল। দুবেলায় হবিষ্যান্ন চলে। কবি খুব খুশী। বললেন[১]—"এই এতদিন ঠিকটি হল, মাছ মাংস সাত-পাঁচ জিনিস, এতে করে পাকযন্ত্রের উপর চাপ দেওয়া হয়, অপকারই ঘটে শরীরের। এই খাবার খেয়ে বেশ বুঝতে পারছি কাল হতে খুবই ভাল বোধ করছি আমি।" কিছুদিন পরে এলেন এক বিদেশী বন্ধু। বললেন—ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য। ডিমে সব রকমেরই খাদ্যগুণ আছে। তারপর? রাণী চন্দের মুখেই শুনুন[২]—"পরদিন হতে কাঁচকলা সরে গেল, ডিম এল। গুরুদেব কাঁচা কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন, একটু নুন গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে নেন। রাতের খাবার দিনের খাবার এই একভাবে চলে। গুরুদেব ভাল-বোধ করেন। বলেন—এই খাবারই চলবে আমার এখন থেকে।"

একদিন এলেন এক আয়ুর্বেদজ্ঞ অতিথি। বললেন—নিমপাতার রস সর্বরোগনাশক। এই কথা শুনে আরম্ভ হল নিমপাতার রস খাওয়া। রাণী চন্দ বলছেন[৩]—"সে কি একটু-আধটু! বড় একটা কাঁচের গ্লাসভর্তি রস, ··· গুরুদেব তা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেন যেন পেস্তাবাটা শরবত খাচ্ছেন। বলেন, জানিস—কী ভাল জিনিস এটা। এ খেয়ে অবধি আমি এত ভাল বোধ করছি, এমনটি কখনও করিনি। বেশি ডিম খাওয়া ভাল নয়; বেশি কেন, ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।"

সেবাগ্রাম থেকে এক অতিথি এলেন। বললেন—রসুন খুব

১, ২, ৩ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ১০৪

উপকারী, বিশেষতঃ বার্ধক্যে, বাপুজী রোজ রসুন খান। বাতের বেদনার উপকার হয়। আরম্ভ হল রসুন খাওয়া।

একবার এক বিদেশী ডাক্তার এলেন। বললেন—সব কিছুই কাঁচা খাওয়া উচিত। কারণ, আগুনের তাত লাগলে খাদ্যের সকল গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ব্যস্, খাও সব কাঁচা। এল লাউ, কুমড়ো, আলু। কুচানো হল। তাতে দেওয়া হল নুন আর লেবুর রস। কবি নিজে খেলেন। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও দিলেন। রাণী চন্দ বলছেন[১]—"আমারও হাতে দিলেন একবাটি, বললেন—তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছ, এখন থেকে এইরকম খাবার খাবে। এতে মোটা হবার ভয় থাকবে না। যত ইচ্ছে খাও—পেটও ভরবে, আলাদা একটা শক্তিও অনুভব করবে।"

এর পরের কাহিনী আরও চমৎকার! গুজরাট থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। বললেন—ক্যাস্টর অয়েলের ময়ান দিয়ে পরটা বানিয়ে খেলে জীবনে আর ডাক্তার ডাকতে হয় না। রাণী চন্দের কথায় বলি[২]—"গুরুদেবের খাবার সময়ে যাঁরা ধারে কাছে থাকি, সেদিন তাদের মধ্যে এক আতঙ্ক ছড়াল। ...... ক্যাস্টর অয়েলের পরটা শুরু হতেই কেউ আর আসি না সাহস করে গুরুদেবের খাবার সময়ে। প্রথম দিনেই প্রমাদে পড়েছিলাম যখন গুরুদেব মোটা পরটার আধখানা ভেঙে হাতে তুলে দিয়ে বললেন, খা-না, খেয়ে দেখ—অতি উপাদেয় এ। মনে কেবল ভরসা—শিগ্‌গিরই আবার আর একজন এল বলে, আর এক ধরনের খাবারের গুণ ব্যাখ্যা করতে।"

---

১ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ১০৫

২ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ১০৬

গুরুদেব কিন্তু খুশী ক্যাস্টর অয়েলের পরটা খেয়ে। বললেন— "এই এতদিনে ঠিকটি হল—যেমনটি নাকি চাইছিলুম।" খাদ্য নিয়ে এইরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সারা জীবন ধরেই চালিয়েছেন। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রকথা'য় লিখছেন[1]—"… যখন কবিপ্রিয়া স্বহস্তে কোনও ব্যঞ্জন রন্ধনের বা মিষ্টান্ন পাকের আয়োজন করিতেন, কবি তখন তাঁহার পার্শ্বে টুল লইয়া বসিয়া প্রচলিত নিয়মে প্রস্তুত করিবার পরিবর্তে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও উপকরণাদির নানারূপ যোগবিয়োগের পন্থা নির্দেশ করিতেন। তাহাতে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা কখনও বা সুখাদ্য কখনও বা অখাদ্য। ইহাকেই কবি বলিতেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরীক্ষা, নিজের উপরেও পরীক্ষা চালাইতে কবি বিরত থাকিতেন না। কখনও কেবলমাত্র ফলাহার, কখনও ভিজে কাঁচা মুগের ডালের উপরে স্যানাটোজেন ছড়াইয়া খাদ্যের ভিটামিন সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন, কখনও নিয়মিত অন্নের পরিবর্তে অকারণে খালি ছাতু বা সুজির হালুয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছেন, আবার কখনও মৎস্য মাংসে রকমারি আমিষাহার, কখনও শুদ্ধ নিরামিষভোজী, কখনও সাত্ত্বিক হবিষ্যাশী। … প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বল্পাহারী, এবং অন্য সর্ববিধ খাদ্য অপেক্ষা ফলই কবির সমধিক প্রিয়, … তাঁহার দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে চাকের মধুর চিরদিনই একটা স্থান ছিল …।"

শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে কবির দীর্ঘকাল পত্রালাপ চলে। পত্রে উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলত। কবি একখানা চিঠিতে লিখছেন[2]—"… মতামত নিয়ে তোমার সঙ্গে আর

১ রবীন্দ্রকথা—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬০, ২৬২

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা—শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮০০শক

বাদানুবাদ করব না···। ওর চেয়ে তুমি যে খিচুড়ি রাঁধবার প্রণালী লিখে পাঠিয়েছ সেটা অনেক বেশী উপাদেয়। আমাদের এখানে একজন রন্ধনপটু ভোজনবিলাসী মানুষ আছে, সে তোমার ডাল ও খিচুড়ির স্বাদ গন্ধ কল্পনা করে পুলকিত, আমাকে যথাবিধি রেঁধে খাওয়াতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। এমনি করে পরোক্ষে তোমার ভোজের নিমন্ত্রণ মাঝে মাঝে আমার ভাগ্যে জুটবে এমন একটা পন্থা পাওয়া গেল। সেই মানুষটা কিছুদিন থেকে নূতন প্রণালীর মোচার ঘণ্ট কোথা থেকে আবিষ্কার করে উত্তেজিত হয়ে আছে।"

একবার শুনলেন আমলকী জিনিসটা খুব উপকারী—রোজ কিছু খাওয়া ভাল। আশ্রমে আমলকী গাছের অভাব নেই, ফলও প্রচুর। আরম্ভ হল আমলকী খাওয়া। যাবেন কলকাতায়, সঙ্গে নিলেন আমলকী। চাকর-বাকররা আমলকী ছেঁচে, আর কবি খান। সকলে অবাক। সুধীরচন্দ্র কর বলছেন[১] —"সহ্যেরও সীমা আছে। হঠাৎ দেখা দিল এমনি অসুখ, নিতে হল শয্যা। তখন ডাক ডাক্তার, আন ওষুধ।"

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য একবার 'যুগান্তর' সাময়িকীতে লিখেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথ পান, বিড়ি, চুরুট সিগারেট কিছুই খেতেন না। এমন কি সুপারি মসলাও মুখে দিতেন না। নস্যিও কখনো নেন নি ···। চকোলেট বা চুইং গাম তিনি মুখে রাখতেন। ··· বাগবাজারের রসগোল্লার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বাগবাজারের ভাপা দইও তিনি ভালবাসতেন।" কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা জ্যোৎস্নালতা দেবী। তিনি ভাল রাঁধতে পারতেন। একবার জনৈক মহিলা

১ কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর, পৃঃ ২৪-২৫

কবিকে লেখেন যে ১১ রকম মোচার তরকারী রাঁধা যায়। কবি জ্যোৎস্না দেবীকে বললেন, 'তুই তো খুব রাঁধতে শিখেছিস্ শুনি, পারিস ১১ রকম মোচার তরকারী রাঁধতে? জ্যোস্না দেবী বললেন, "১১ রকম কেন, আমি ১৫ রকম মোচার তরকারী রাঁধতে পারি।' 'সত্যি? তবে খাওয়া আমাকে কাল থেকেই,—।" জ্যোৎস্না দেবী এক একদিন এক একরকম মোচার তরকারী রেঁধে পাঠাতে লাগলেন। মোচার ঘন্ট, ডালনা, চপ, কাটলেট, কোপ্তা, পাতুরী, আমিষ, নিরামিষ। তেরো রকম খাওয়ার পর কবি কোথায় যেন গেলেন, কাজেই পনেরো রকম খাওয়া হয় নি। তবু খুব খুশী হয়ে বললেন, তোকে সার্টিফিকেট দেব।" ১

শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব শিক্ষক ৺নেপাল রায়। তাঁর পুত্রবধূ কমলা দেবী। কমলা দেবী যখন নববধূ তখন শান্তিনিকেতনে আসেন। কবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। কবি যখন শুনলেন যে কমলা দেবীর পিত্রালয় যশোর, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "চৈ, কচু আর বড়ি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রাঁধতে পার? আর কুলির অম্বল, মুগির ডাল?" ('চৈ' হচ্ছে যশোর জেলার একরকম লতা গাছের শিকড়। তরকারীতে দিলে স্বাদ বাড়ে। কবি এই 'চৈ' খুব ভালবাসতেন।) নেপালবাবুর বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে নানাপ্রকার পিঠে কবির কাছে আসত। একবার এক মহিলা কিছু পিঠে তৈরী করে পাঠান। সেই পিঠে খেয়ে কবি ঐ মহিলাকে বলেছিলেন,

"লোহা কঠিন, পাথর কঠিন, আর কঠিন ইষ্টক,
তার অধিক কঠিন কন্যে, তোমার হাতের 'পিষ্টক।' ২

১ অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৬৯
২ অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ জ্যৈষ্ঠ, „

একদিন রবীন্দ্রনাথের মুড়ি খাওয়ার ইচ্ছা হোলো। পাঠালেন ভৃত্য মহাদেবকে সন্তোষ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। বাড়ীর কর্ত্রী সঙ্কোচের সঙ্গে কিছু মুড়ি দিলেন। মনটা তাঁর খুঁত খুঁত করতে লাগলো মুড়ি গরম নয় বলে। একদিন গরম মুড়ি ভেজে ঘরের তৈরী কিছু সন্দেশ সহ স্বামীকে পাঠালেন কবির কাছে, কবি তখন একটু অসুস্থ। সন্তোষ বাবুকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি এনেছিস্ রে, দেখা ত!" দেখে খুব খুশী হয়ে বললেন, "রেখে যা, ওরে এ জিনিস পাওয়া যায় না, সেবা দেব।" [১]

শিল্পী মুকুনদে-র স্ত্রী বীণা দে শুনলেন রবীন্দ্রনাথ তপসে মাছ, চন্দ্রপুলি ও আইসক্রীম খেতে ভালবাসেন। যখনকার কথা তখন শান্তিনিকেতনে আইসক্রীম পাওয়া যেতো না। শ্রীমতী দে কলকাতা থেকে আইসক্রীমের যন্ত্র, বরফ, তপসে মাছ আনালেন। তারপর সব কিছু প্রস্তুত করে উপস্থিত হোলেন কবির কাছে। দেখে কবি খুব খুশী।[২]

একদিন শ্রীসুধীর করকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওহে, শুনলাম তোমার দেশ থেকে তোমার মা এসেছেন। খুব তোয়াজ করে যে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন, তা তো তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, —তা বেশ ভালই হয়েছে।" সুধীর কুমারের মা একদিন রাঁধলেন সুক্তোনী, ঝিঙ্গেপাতুরী, মাছের মুড়োর ডাল, কচি আমের পাতলা ডাল, মাছের ঝোল, পাটিসাপ্টা ও রসমাধুরী। তারপর সব কিছু নিয়ে উপস্থিত হলেন কবির কাছে। কবি তখন খেতে বসেছেন। বাড়ীর তৈরী খাবার সেদিন আর খেলেন না। খেলেন সুধীর বাবুর মায়ের রান্না করা খাবার। খেয়ে খুব খুশী হলেন।[৩]

১ অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬৯
২ অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ভাদ্র, „
৩ অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ শ্রাবণ „

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন যে তিনি ওঠেন নি অথচ তাঁর মিতা রবি উঠেছেন জীবনে এমন কখনও ঘটেনি। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলছেন[১]—"বারোমাসই অতি প্রত্যূষে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন—কখন উঠতেন কখন মুখ-হাত ধোয়া শেষ করতেন, কেউ জানত না—সূর্যোদয়ের আগেই দেখা যেত, 'শ্যামলী'র বারান্দায় বসে হয় লিখছেন, নয় ছবি আঁকছেন, নয় কিছু পড়ছেন। বহুজন চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই প্রাতুরুত্থানের পাল্লায় কেউই তাঁকে পরাস্ত করতে পারেন নি।" কবি বলছেন মৈত্রেয়ী দেবীকে[২]—"দেখেছ তো আমায় শান্তিনিকেতনে, ভোরবেলা উঠে ব'সে থাকি, অপেক্ষা ক'রে থাকি কখন আমার আকাশের মিতা আসবে, আমায় আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেবে। কি করে এ নামের ঐক্য হল জানিনে, আমি যে আলোর পূজারী, সূর্যোপাসক।" কবি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে একবার বলছেন[৩]—"রোজ শেষ রাত্রে জেগে সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত নিজের মনকে আমি স্নান করাই। 'শান্তম্‌' আমার মন্ত্র।" "রাত কেটে গিয়ে যখন ভোর হয়, সেই সংগম-সময়টিকে প্রতিদিন দেখেছেন।"[৪] লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু।

কবি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করতেন। বসতেন পূর্বদিকে মুখ করে। সূর্য উদিত হত। আলো এসে পড়ত তাঁর

---

১ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১১০

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ২৯

৩ বাইশে শ্রাবণ—নির্মলকুমারী মহলানবীশ, পৃঃ ৬

৪ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১২৫

মুখে। উপাসনা শেষ হত। তারপর চলত—কাজ অবিরাম। চিঠিপত্র পড়া, প্রত্যেকখানার উত্তর দেওয়া, নিজহাতে ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, অতিথি-অভ্যাগতদের ঝামেলা সহ্য করা। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। আছে শোক-তাপ, আছে অর্থের চিন্তা কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। ধৈর্যে তুষারমৌলী হিমালয়ের মতই স্থির, ধীর, শান্ত।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। কবির স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্য লাভ করবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। একদিন শরৎকালের প্রত্যূষে তিনি কবিকে যে ভাবে দেখেছিলেন তার একটি চমৎকার বর্ণনা দিচ্ছেন[১]—"শ্যামলী'র ছোট্ট আঙিনায় একটা চেয়ারের উপরে বসে আছেন ধ্যানমগ্ন কবি, মাথা ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, চোখের দৃষ্টি মুদিত, এক হাতের উপর আর এক হাত কোলে ন্যস্ত, সমস্ত মুখমণ্ডলে এক আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত জ্যোতি। মনে হল, দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে যেন তিনি প্রভাতের মাধুর্যরস শুষে পান করে নিচ্ছেন। পূব-আকাশে সবেমাত্র একটি নবজাতক দিনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, ঘুমন্ত পৃথিবীর সদ্য-জাগা তন্দ্রালস দৃষ্টি, গাছের ডালে আবডালে পাখীদের কলধ্বনি। আমি দাঁড়িয়ে আছি চিত্রার্পিতের মত। … রবীন্দ্রনাথ অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করতে চিরাভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর আকাশের মিতা জেগেছেন, অথচ তিনি জাগেননি, সুস্থ অবস্থায় এমন দুর্ঘটনা তাঁর জীবনে কোনোদিন ঘটেছে বলে মনে হয় না। পাখী যেমন বিলীয়মান অন্ধকারেও আপন অশান্ত ডানার ব্যাকুলতায় পূর্বাহ্নে প্রভাতের আগমনী-বার্তা

১ রবিচ্ছবি—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ ৬৪, ৬৫

পেয়ে নীড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, তিনিও তেমনি আগন্তুক দিবসের সূচনা সমগ্র চৈতন্যে অনুভব করে বেরিয়ে পড়তেন প্রাতর্ভ্রমণে। ··· সেই এক শরৎপ্রাতে দেখেছিলাম তাঁর এক আত্মসমাহিত মূর্তি, ধ্যানের প্রশান্তিতে স্থির, নিষ্কম্প, আনন্দে উজ্জ্বল—প্রভাত-সূর্যের বন্দনাগানে মর্মরিত গাছের পাতার মত সমস্ত সত্তাকে উদ্ঘাটিত করে রেখেছেন নবোৎসারিত আলোর পানে।"

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতনে। একদিন বৈশাখ মাসের দুপুরবেলা তিনি গিয়েছেন কবি-সন্নিধানে। কবি তখন থাকতেন 'পুনশ্চে'। কাননবাবু দেখলেন[১]—"ঘরের সমস্ত জানালা খোলা। গায়ে রয়েছে একটা ফিকে, গৈরিক রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির গলার কাছে দু-একটি বোতাম খোলা। ঘরে না ছিল বিজলীপাখা, না বা খসখস। আমি অবাক হয়ে গেলুম। পরিপূর্ণ বার্ধক্যে এমনভাবে তাঁকে কাজ করতে দেখব, আশা করিনি। মনে হল, এ ত প্রায় ধর্মসাধকের কৃচ্ছ্র সাধনা।"

কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখছেন[২]—"Throughout his life he worked all hours of the day. His day began at about 4 A.M. while it was still dark. ···Father did not take any rest during the day. Even during the hottest days of summer, he would sit at his desk and work with the doors and windows wide open, absolutely indifferent to the hot blasts blowing around him. Most of his writing was done

---

[১] মানুষ রবীন্দ্রনাথ—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৬-৯৭

[২] On the Edges of Time—Rathindranath Tagore, P. 182-83

at night.···Four to five hours of sleep was all that he needed."

মধ্যাহ্নভোজনের পর একটু বিশ্রাম—এ যেন জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি বার্ধক্যে কোনদিনই মাধ্যাহ্নিক বিশ্রাম তাঁর ছিল না। ১৮৯৪ সালে সাহাজাদপুর থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন[১]—"আমরা বাঙালীরা কষে মধ্যাহ্নভোজন করি বলেই মধ্যাহ্নটাকে হারাই। দরজা বন্ধ করে, তামাক খেতে খেতে, পান চিবোতে চিবোতে পরিতৃপ্ত নিদ্রার আয়োজন হতে থাকে, তাতেই আমরা বেশ চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে উঠি।" "শান্তিনিকেতনের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের দুপুরে ঘরে ঘরে যখন দরজা বন্ধ, তিনি কতদিন বারান্দায় বসে কাটিয়েছেন দিগন্তছোঁয়া মাঠের মধ্যে দৃষ্টি মেলে।"[২] "গ্রীষ্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সহিষ্ণুতা" লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না। বীরভূমের দারুণ গরমেও দুপুরবেলা ঘরের দরজা-জানলা খুলে দিয়ে তিনি লেখাপড়া করতেন। এ সম্পর্কে একটি মজার কাহিনী আছে। লিখেছেন দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল[৩]—"একবার রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতার পর, মহাত্মাজী এসেছেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথকে একদিন তিনি বললেন—গুরুদেব, একটা ভিক্ষে দিতে হবে; দুপুরে খাবার পর আপনাকে একটু করে ঘুমুতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—ঘুমুইনি যে দুপুরে কখনও। মহাত্মাজী তবুও অনুরোধ করেন—না ঘুমোন, কিছুক্ষণ শুয়ে

১ ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৩৩

২ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১২৫

৩ শনিবারের চিঠি—বৈশাখ, ১৩৬৮

বিশ্রাম নেবেন। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন বাদে একদিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দুপুরে রবীন্দ্রনাথের ঘরে এসে দেখেন তিনি ঘুমুচ্ছেন। ফিরে যাচ্ছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন, এমন সময় রবীন্দ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হল—ঘুমুইনি আমি—'তবে ?' 'মহাত্মাজীকে ভিক্ষে দিচ্ছিলাম'।" নন্দগোপালবাবু বলছেন[১]—"গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তাঁকে দেখেছি, খাড়া চেয়ারে বসে একান্ত মনে লেখাপড়ায় নিবিষ্ট থাকতে, আর তখনো তাঁর সর্বজনবিদিত পোশাকেই সর্বাঙ্গ আবৃত করে থাকতেন।" সীতাদেবী তাঁর স্মৃতিকথায়[২] লিখেছেন—"...তাঁহার খাওয়া হইয়া যাইবার পর তাঁহার ঘরে আসিতে বলিলেন। খাওয়ার পরেই গান শিখাইতে বসিলে তাঁহার কষ্ট হইবে আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমি যা খাই, তাতে আমার পেটে বিশেষ জায়গা নেয় না, আমার বিশ্রামের কোনই দরকার হয় না, তোমাদের যখন খুশি এস'।" কবির দীর্ঘ সান্নিধ্যলাভে ভাগ্যবান অন্যতম সহচর সুধীরচন্দ্র কর মহাশয় লিখছেন[৩]—"দেহলীতে যখন ছিলেন, গ্রীষ্মের দুপুরে বারান্দায় বসে কবিতা লিখতেন। সেই রোদের ঝাঁজ, হা-হা করা গরম হাওয়ায় লেখার আবেশ নাকি গাঢ় হয়ে উঠত। দরজা-জানালা বন্ধ, আরামে সবাই বিশ্রাম করছে, আর তিনি তাঁর ঘরে লিখে চলেছেন, হাতে একখানা হাতপাখা।" "১৯৩৭ সালের প্রথম অসুখের পর থেকে সকলেই দুপুরে একটু বিশ্রাম করতে বলতেন। কখনো বিছানায় শুতে রাজী করানো যেত না, আরামচৌকিতে

---

১ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১১০

২ পুণ্যস্মৃতি—সীতাদেবী, পৃঃ ১৯৮

৩ কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর, পৃঃ ২৫

পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতেন।"—বলেছেন নির্মলকুমারী মহলানবীশ[১]। কবি তাঁকে বলেছেন[২]—"ছেলেবেলায় যখন পৈতে হয় তখন প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে দিনে ঘুমোব না···ছেলেবেলার সেই নিয়ম জীবনে বরাবর পালন করেছি, দিনে ঘুমোনো অভ্যাস করিনি।" অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ তাঁর 'কবিস্মৃতি'তে লিখেছেন—"বোলপুর বা কলকাতার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অসহ্য গরম, দুপুরবেলা চারিদিক রোদে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কখনো দরজা জানালা বন্ধ করতেন না।"

রাণী চন্দ লিখছেন[৩],—"ভোরবেলাকে গুরুদেব বড় পছন্দ করতেন। যত ভোরেই উঠি না কেন, দেখতাম, আরও ভোরে তিনি উঠে বসে আছেন। ···বলতেন, সকালে খানিকক্ষণ সূর্যের আলো গায়ে না নিলে আমার ভাল লাগে না। ··· রাত্রির শেষপ্রহরে যখন বাইরে এসে বসি, আকাশ শান্ত, বাতাস স্তব্ধ, পাখিরা জাগেনি, গাছগুলিতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার—সব মিলিয়ে একটা গভীর নিস্তব্ধতা। তখন যে আনন্দ অনুভব করি তার নাম শান্তি।" রাণী চন্দ আরও বলছেন[৪]—"দুপুরে বিশ্রাম নিতেও রাজী থাকতেন না। এক এক সময় ভেবে অবাক হতাম, এখনও হই যে, কি করে একজন মানুষ সকাল হতে সন্ধ্যে অবধি এমনতরো একটানা একটা পিঠে সোজা চেয়ারে বসে লিখে যেতে পারেন।"

---

১ বাইশে শ্রাবণ—নির্মলকুমারী মহলানবীশ, পৃঃ ৩৭

২ বাইশে শ্রাবণ—নির্মলকুমারী মহলানবীশ, পৃঃ ৭

৩ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ৭৪

৪ গুরুদেব—রাণী চন্দ, পৃঃ ৬২

শুনতাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ? বাপ রে! সে যে দেবদর্শনের চেয়েও দুর্লভ! যাঁরা অভিজাত কেবল তাঁদেরই তিনি দেখা দেন। সাধারণ মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু এ কথা যে নিছক কল্পনাপ্রসূত তাই নয়, বিদ্বেষপ্রসূতও। সকলেরই জন্যে দ্বার তাঁর উন্মুক্ত ছিল। তবে স্বাস্থ্যের খাতিরে—ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে কখনও কখনও অবাধ যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে, বৈকি। এ সম্পর্কে সুধীরচন্দ্র করের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি[১]—"কবির কাছে আসতে পেরেছে সাধারণ লোকেরাও। গ্রামের লোক, ছেলেমেয়েরা, বোষ্টম ভিখারী, চাষী, প্রজা—সবাই এসেছে। অনেকে পোঁটলাপুঁটিলি সহ এসে, ধীরে গৃহে প্রবেশ করে প্রণাম জানিয়ে চলে গিয়েছে, কোথা থেকে আসা, চাষের অবস্থা কেমন, ফসল কেমন হয়েছে এবং আশ্রম দেখা হয়েছে কিনা—ইত্যাদি দু-চারটি কথা বলে কবি তাদের সন্তোষবিধান করতেন।" প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন[২]—"অনেকের ধারণা আছে যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অপরিচিত লোকের দেখাসাক্ষাৎ হওয়া কঠিন ছিল। ইহা মোটেই সত্য নহে। যে-কেহ ইচ্ছা করিলেই তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রচুর সময় নষ্ট করিয়া দিতে পারিত; কেবল একটু সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই।" কবি জসীম উদ্দীনের ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং কিছুদিন ঠাকুর-

---

১ কবিকথা—সুধীরচন্দ্র কর, পৃঃ ৯৭

২ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী, পৃঃ ১৩২

বাড়ীতে বাসও করেছিলেন। তিনি লিখেছেন[১]—"আপন-পরের জ্ঞান তাঁর থাকিত না। তাঁর ভক্তেরা দিন-রজনী পাহারা দিয়াও কবির নিকটে সেই পর-মানুষের আসা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। কেহ দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে জানিলে কবি বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।" নির্মলকুমারী মহলানবীশ লিখছেন[২]—"শরীরের দোহাই পাড়লে বলতেন, 'যারা মানী লোক তাদের ফিরিয়ে দিতে আমার দ্বিধা হয় না, কিন্তু যারা অতি অভাজন, যাদের সকলেই অনায়াসে অবজ্ঞা করতে পারে, তাদেরকে দেখা হবে না বলতে আমি পারিনে। আমি জানি এতে আমার সময় নষ্ট হয়, বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু উপায় কি বল'?"

সেবার কবি খুব অসুস্থ। তাঁর কাছে লোকজন নিয়ে যাওয়া বারণ। মৈমনসিং থেকে একটি ছেলে এসে তিনদিন ধরে বসে আছে শুধু কবিকে একবার চোখের দেখা দেখবে, কিন্তু কোন উপায় হচ্ছে না। কবির কানে শেষ পর্যন্ত কথাটা গেল। শুনে বললেন—"আহা, ডেকে আন না একবার। আমি কথা না বললেই তো আর ক্লান্ত হব না। দেখ, আমি এত বড়লোক নই যে একবারটি দেখা দিতেই ক্ষয়ে যাব। আমার ভাল লাগে না, তোমরা এই রকম করে সবাইকে ঠকাও বলে।"[৩]

প্রখ্যাত চিকিৎসক পশুপতি ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় সম্পর্কে লিখেছেন[৪]—"কয়েক দিন গিয়ে দেখলাম,

---

১ ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়—জসীম উদ্দীন, পৃঃ ৪৭

২ বাইশে শ্রাবণ—নির্মলকুমারী মহলানবীশ, পৃঃ ৩৭

৩ বাইশে শ্রাবণ—নির্মলকুমারী মহলানবীশ, পৃঃ ৩৮

৪ শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃঃ ৮৫৬

তাঁর দ্বার অবারিত, সকলেই তাঁর কাছে অনায়াসে চলে যায়, সকলের সঙ্গেই তিনি কথা বলেন। কত লোক যে তাঁর কাছে আসে, অনবরতই তাঁকে ঘিরে থাকে, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সর্বদাই তিনি নিযুক্ত থাকেন।”...

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—একদিনের একটি ঘটনা সম্পর্কে লিখছেন যে কবি তখন ছিলেন বেলঘরিয়ায় ‘গুপ্ত নিবাসে’—অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের বাড়ি। একদিন দুপুরবেলা এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত। তিনি রবীন্দ্র-দর্শনপ্রার্থী। দেখে দরিদ্র বলেই মনে হয়। তিনি বললেন যে তিনি বহুদূর থেকে পায়ে হেঁটে রবীন্দ্র-দর্শনে এসেছেন এবং ফিরেও যাবেন পদব্রজে। হিন্দুমতে দেবদর্শনে গেলে পায়ে হেঁটে যাওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে দেবতা। তাই এই পদযাত্রা। প্রথমে সুধাকান্তবাবু রাজী হলেন না। ভদ্রলোকটির অনেক কাকুতি-মিনতির পর তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। কবি তখন চা পান করবেন। লোকটির কথা শুনে বললেন—“এখনই নিয়ে আয়।” সুধাকান্তবাবু লোকটির কাছে এলেন। ইচ্ছে করেই একটু দেরি করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য—কবির চা খাওয়াটা শেষ হয়ে যাক। কিন্তু দেরী দেখে কবি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পাঠিয়েছেন বনমালীকে। ভদ্রলোকটি সঙ্কোচের সঙ্গে এসে কবিকে প্রণাম করে চেয়ারে না বসে মেঝেয় কার্পেটের উপর বসলেন। কবি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। চা সন্দেশ খাওয়ালেন। সন্ধ্যার সময় কবি ঐ ভদ্রলোকের কথা পেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন—“এরাই বারে বারে বিতাড়িত হয় আমার দ্বার থেকে আমার রক্ষকদের দ্বারা। আড়ম্বর আর পোশাক-পরিচ্ছদের পাসপোর্ট নেই এদের, তাই তোরা

অনায়াসে এদের অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিস। তোরা মনে করিস কাউকে তাড়িয়ে দেওয়াটা খুব একটা বাহাদুরি। তোরা আসলে কাপুরুষ। হ্যাটকোট-পরা অনেক আন্‌ডিজায়রেব্‌ল মাতব্বর কাউকে তাড়াবার সাহস তোদের নাই। তাদের তোরা মাথা হেঁট করে খোশামোদ করে মাথায় তুলে আমার কাছে এনে উপস্থিত করিস্, তখন আমার দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা তোদের মনেও থাকে না—এই রকমের গরিব বেচারাদের বেলায় তোমাদের কর্তব্যবোধ টনটনে হয়ে ওঠে। আমাকে দেখতে এসে এইরকম কত লোক তোদের হাতে না জানি কি লাঞ্ছনাই ভোগ করে! তোরা মনে করিস, আমি তোদের এইসব কর্তব্যবোধের বিষয় কোন খোঁজ-খবর রাখি না। রাখি, কিন্তু কিছু করতে পারব না জেনেই সব সহ্য করি।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সহজলভ্যতা সম্পর্কে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখছেন[২]—"তিনি কারুকেই বিমুখ করতেন না, কোন কিছুতেই বিচলিত হতেন না, সকলকেই এবং সব কিছুকেই সহজভাবে স্বীকার করে নিতেন।"

বুদ্ধদেব বসু গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। তিনি লিখছেন[৩]—"তাঁর দুয়ার সব সময়েই খোলা। নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, পারতপক্ষে কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেন না; তাঁর উপর ছোটো বড়ো কত যে দাবি তার অন্ত নেই, সাধ্যমতো সবই পূরণ করেন।"

---

১ শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃঃ ৮১৫

২ কাছের মানুষ ররীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৭

৩ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১০২

১৮৩৬ সালে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একবার শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি যেদিন পৌঁছালেন তার পরদিন বিকালে কবির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলো। কবি তাঁকে—দুঃখ করে বলেছিলেন[১]—"—দেখ আজ এরা (মানে তত্ত্বাবধাকরা) আমার ঘরের সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে—এখন কারো সঙ্গে দেখা বা আলোচনা করা আর লেখা সবই নিষেধ, কারণ আমার নাকি সম্পূর্ণ বিশ্রাম দবকার।" এ সম্পর্কে কবির জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখছেন[২]—"He never liked any visitor, whatever his mission, to be kept waiting."

শ্রীমতী রানীচন্দ লিখছেন, "বিচিত্র রকমের অতিথি আসত গুরুদেবের কাছে। তাঁদের সবাইকে তিনি সয়ে নিতেন।...... কাউকে তিনি কাছে আসতে বাধা দিতেন না।......অবারিত দ্বার, কেউ দেখা করতে এসে ফিরে গেছে, শুনিনি কখনও।...... দূর-দূরান্ত দেশ-দেশান্ত হতেও কতশত জন আসতেন। সময় নেই অসময় নেই, হাসিমুখে সবাইকে অভ্যর্থনা করেছেন, ভালো বেসেছেন।" একবার এক পাগল এসে উপস্থিত, সে কিছুতেই কবিকে ছাড়ে না। তিনি লিখছিলেন। কিন্তু উপায় নেই। পাগল বার বার বাধা দেয়। সেই দিন কবি একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। পরদিন থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার একটা নিয়ম বাঁধা হেলো। কবি সেটা জানেন না। দু একদিন পরে তিনি দেখেন একটি লোক বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছে। ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন। ডাকলেন সেক্রেটারীকে। বললেন, "তোরা কি ভাবিস্ আমি

---

১ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—যুগান্তর সাময়িকী, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭০

২ on the edges of time—p. 182

একটা কেউ কেটা, নবাব, বাদশা? আমার কাছে আসতে হলে সেপাই সান্ত্রী পেরিয়ে তবে আসতে হবে? আহা, বেচারারা—দূর দূর হতে আসে, কি, না—আমায় একটু দেখে যাবে, কি প্রণাম করবে—না হয় দুটো কথাই বলবে। তার জন্য এত কি, কড়াক্কড়ি? দোর আমার খোলা থাকবে, যার যখন মন চায় আসবে আমার কাছে, কাউকে বাধা দিস্‌নে যেন তোরা আর কখনও।"

আনন্দ—রাগ—অভিমান

মনটা যখন খুশী থাকতো তখন চেয়ারে বসা থাকলে, গা একটু এলিয়ে দিয়ে ঘন ঘন পা দুলাতেন।

বিরক্ত হলে—"ভ্রূযুগল আকৃষ্ট হইয়া প্রায় সংযুক্ত হইত, মাঝখানে দুটি ঊর্ধ্বগামী রেখাপাত করিত, মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিত, হাত দুখানি কোলের উপর পড়িয়া থাকিত……কোনো রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেন না…… বাক্যের অভাবেই তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ পাইত……। নিতান্ত কিছু বলিতে হইলে শূন্যের দিকে চাহিয়া বলিয়া যাইতেন……স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।"[১]

বুদ্ধদেব বসু গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। এক প্রৌঢ় অধ্যাপক তাঁকে বলেন যে তিরিশ বছরের মধ্যে মাত্র দুবার কবিকে তিনি রাগতে দেখেছেন। একবার রেগেছিলেন তাঁর খাবার থালাতে ময়দা ছিল বলে—আর একবার একটি শিক্ষক বাড়ির দাওয়ায় বসে দুজন ছাত্রকে দিয়ে গা টেপাচ্ছিলেন বলে। অধ্যাপক মশায় বলেন—"তাঁর অমন রাগ আমরা কখনো দেখিনি।"[২]

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় লিখছেন,—"তিনি যখন রাগতেন তখন দারুণ রাগতেন, কিন্তু ভুলেও অশোভন উক্তি করতেন না। মুখের উপর লেখনীর উপর তাঁর কঠোর শাসন ছিল। জীবনের কোনো অবস্থাতেই তিনি আপনাকে খেলো হতে দেননি।"[৩]

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর কবি 'সার্বভৌমে' বলছেন, "যা

---

১ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—শ্রীপ্রমথ বিশী, পৃঃ ১২৯-৩০

২ সব পেয়েছির দেশে—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১০০

৩ দেশকালপাত্র, পৃঃ ৫৭

রূঢ় যা কর্কশ তা তাঁর চারপাশে কোথাও স্থান পেত না। যে ভাষায় তিনি সর্বদা কথা বলতেন তাও ছিল সাহিত্যের ভাষা, এমন কি যখন কাউকে ভর্ৎসনা করতেন তখনও তাঁর ভাষা নেমে আসত না।......কখনও তাঁকে জোরে চেঁচিয়ে কাউকে ভর্ৎসনা করতে শুনিনি। কখনই প্রায় আত্মবিস্মৃত হতেন না।......বিস্মিত হয়ে দেখতুম যে ভৃত্যকেও ভর্ৎসনা করবার সময় তিনি তাঁর সুমধুর ভাষার সঙ্গে কৌতুক মিলিয়ে ভর্ৎসনা করতেন। স্বাভাবিকের চেয়ে গলার স্বর এক পর্দাও উপরে উঠত না!"[১]

এ সম্পর্কে চমৎকার দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন শ্রীঅতুল সেন, "একটা খুব দামী ল্যাম্প নিতান্ত অসাবধানতায় চাকরের হাত হইতে পড়িয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় বস্তু, তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন; মনে হইল চাকরকে ভয়ঙ্কর রকম শাস্তি দিবেন। অপরাধী হুজুরে হাজির হইল, তিনি তাহাকে কষিয়া গালি দিলেন, তাহার ভাষা এই, 'তোদের এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই, এতটুকু সতর্কতা নেই, মনিবের জিনিসের উপর কোনও মায়া নেই ......ইত্যাদি'। "একটি চাকরের চুরি ধরা পড়ে। তিনি তাকে এই ভাষায় তিরস্কার করেন, "হিসেবে গোলমাল হলে তাকে তো তস্করতা আখ্যা দেওয়া যায়...... ।"[২]

মহাদেব ছিল কবির এক হিন্দুস্থানী ভৃত্য। একদিন কবি অনেকগুলো ছবি এঁকে রেখে কোথায় গিয়েছেন। মহাদেব টেবিল পরিষ্কার করতে এসেছে। কাগজের নীচে ছিল একটা রঙের বাটি। সে দেখতে পায়নি। বাটি উল্টে সমস্ত ছবি গেল নষ্ট

১ কবি সার্বভৌম—মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ৪১

২ শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৪৮

হয়ে! ভয়ঙ্কর ভয় পেলো মহাদেব, ছুটলো অনিলবাবুর কাছে। অনিলবাবু এসে কবিকে সব বুঝিয়ে বললেন। শুনে কবি বললেন,[১] "ভয় পাচ্ছে কেন? ওর কী দোষ? আমারই ভুলে রঙের বাটিটা ওখানে ছিল।" আর মহাদেবকে বললেন, "সব সময় খেয়াল থাকে না, ওখানটা ঝাড়পোঁছ একটু সাবধানেই করিস।"

বনমালী কবির উৎকলবাসী ভৃত্য। কবি তার নাম দিয়েছিলেন, নীলমণি। কখনো কখনো আবার লীলমণি বলেও ডাকতেন। একদিন বনমালী কি একটা অন্যায় করে ফেলেছে। কবি বিরক্ত হয়েছেন। বললেন,[২] "জানিস, তোর আচরণ যদি সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জানাই, তাহলে দেশ জুড়ে এক্ষুনি প্রতিবাদের ঝড় বইবে, বড় বড় 'স্তম্ভ' লেখা হবে, চাই কি একটা অনাস্থা প্রস্তাবও গৃহীত হতে পারে!"

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সীতা সম্পর্কে সন্দীপনের উক্তিকে কেন্দ্র করে দেশে একটা বিরাট বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত কবি সেই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে লিখছেন, "...যদি জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলা দেশে আমার জন্ম না হয়—এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুক—আমি ব্রাত্য আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু বিচার ধর্মসঙ্গত।"

আর একটি ব্যাপারে কবি খুব উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হন। তাঁর 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গানটি দিল্লীদরবার উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জকে উদ্দেশ্য করে লেখা বলে অনেকে মন্তব্য করেন। কথাটা

---

১ কবিকথা—পৃঃ ৭৯-৮০

২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—পৃঃ ১৫

কবির কানে গেলে তিনি বলেন,[১] "দেশের অসংযত রসনা চিরদিন শুধু আমার উদ্দেশে বিষই উদ্গার করে চলেছে, আমার সমস্ত কাজ সমস্ত প্রচেষ্টাকে হীন প্রতিপন্ন করার কি অদম্য উৎসাহ! কোন একটা বিষয়ে যদি মনের মতো হয়ে চলতে না পারলাম, তাহলেই সারা জীবনে যা কিছু করেছি, সঙ্গে সঙ্গে তা ধূলিসাৎ করে দিতে কারুর বাধে না। যৌবনে লিখেছিলাম সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে—যাবার আগে ঐ পঙ্‌ক্তিটা কেটে দিয়ে যাব আমার রচনা থেকে।"

কবি যেবার নোবেল পুরস্কার পেলেন সেইবার লণ্ডন থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন,[২] "ভালো লাগচে না—কেননা আমি আলোর কাঙাল; আমার সেই বোলপুরের মাঠের উপরে একেবারে আকাশ উপুড় করে ঢালা আলোর জন্যে হৃদয় পিপাসিত হয়ে আছে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুনতে হবে, কত বিরোধ বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি, তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছুদিন থাকি, যতদিন পারি এই কাকলী থেকে দূরে থাকি।"

কবির মন অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল। এতটুকু সমালোচনা তিনি সইতে পারতেন না। অভিমান ছিল মনে যে, দেশ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। তাই ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে ৫০০ শত বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে শান্তিনিকেতনে যান তখন কবি যা বলেছিলেন তাতে সকলেই ক্ষুণ্ণ হন। কবি

১ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—পৃঃ ৭৫

২ লণ্ডন, ৬ই মে, ১৯১৩

সেদিন বলেছিলেন, "......আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্ঠ পর্যন্ত ঠেকাব কিন্তু এ মদিরা আমি গ্রহণ করতে পারব না।"

১৯৩১ সালে কবির বয়স ৭০ বৎসর পূর্ণ হোলো। এই উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে ডিসেম্বর মাসে ৭ দিন ব্যাপী জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ছাত্র-সমাজ কবিকে সম্বর্ধনা জানান। এই সভায় কবি একটি চমৎকার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। এই ভাষণটির মধ্যে স্থানে স্থানে কবি অভিমান প্রকাশ করেছেন। এক জায়গায় বলছেন,[১] "এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি।" তিনি আরও বলেন,[২] "ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়, বুদ্ধিমান মহাজন খেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফসল যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফসল-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।"

১ আত্মপরিচয়—পৃঃ ৭৬
২ আত্মপরিচয়—পৃঃ ৭৬

চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা সম্পর্কে শ্রীসুধীরচন্দ্র কর তাঁর 'রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-পরিচয়' গ্রন্থে লিখছেন—"কবির চিকিৎসা বিদ্যানুরাগের কথা অনেকে জানেন। তবে কবিদের রাজা কবিরাজীর চর্চায় তেমন হাত দেন নি। একবার লেখক অসুখে পড়েন, অফিসে তাঁকে সময়মতো না পেয়ে ভৃত্য মহাদেবকে খোঁজে পাঠান বাসাতে। অসুখ জেনে অমনি তার হাতেই পাঠিয়ে দেন এক শিশি বড়ি। কিন্তু সে কবিরাজী বড়ি নয়, এ ছিল বায়োকেমিক ওষুধ।" শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (অধুনা স্বর্গত) বলেন, "এক সময়ে প্রথমে হোমিওপ্যাথিতেই কবির বিশেষ নিষ্ঠা ছিল এবং তিনি এই মতে চিকিৎসায় কৃতকার্যও হয়েছিলেন……। বহু অর্থব্যয়ে তিনি হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের পুস্তকাদি ক্রয় করেছিলেন ও বিদেশ হতে মূল্যবান ঔষধাদি আনিয়েছিলেন।"

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের 'ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—"আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে হঠাৎ ভিষক ডাক্তার হতে হয়…। তার দৃষ্টান্ত দেই, সাঁওতালপাড়ার মা এসে আমার দরজায় কেঁদে পড়ল তার ছেলেকে ওষুধ দিতে হবে।……বই খুলে বসতে হল—বড়াই করতে চাইনে, পসার বাড়াবার ইচ্ছে মোটেই নেই—সে রোগী আজও বেঁচে আছে ;……বহুকাল পূর্বে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম ; সেখানেও রোগীরা আমাকে অসাধ্য রোগের মতোই পেয়ে বসেছিল—ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম। শেষকালে তাদেরই হল জিত। যাদের সাধ্য গোচরে কোথাও

কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধ'রে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড়ো নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারিনে যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা চিকিৎসকদেরও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।"

হোমিওপ্যাথির চর্চা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কারণ হোমিওপ্যাথির চর্চায় যে পরিমাণ সময় দেওয়া প্রয়োজন কবির হাতে সে সময় ছিল না। তাই বায়োকেমিকের দিকেই তিনি মনোযোগ দেন। কবির নিজের কথায় বলি—"একসময়ে সত্যিই অনেক বড় বড় অসুখ সারিয়েছি, হোমিওপ্যাথি নিয়ে কম সময় দিইনি, ভাল ভাল হোমিওপ্যাথির বই ছিল আমার। তন্ন তন্ন করে পড়েছি।...কিন্তু ওতে পরিশ্রম আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিম্প্‌টম্‌ মেলানো কম হাঙ্গামা নয়, সেজন্যে এখন আর ও হয়ে ওঠে না। বায়োকেমিক অনেক সোজা আর খুব Efficient." এলোপ্যাথি সম্পর্কে কবির মত[১] এলোপ্যাথিতে যত ওষুধ যে পরিমাণে শরীরে ঢোকান হয় তার প্রয়োজন নেই। এই দেখ না ক্যালসিয়াম। এলোপ্যাথিতে যেরকম ভাবে ক্যালসিয়াম খাওয়ায়, এই এতখানি করে—তার কিছুই assimilated হয় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম cell তাদের গ্রহণ-বর্জন সবই সূক্ষ্ম। একগাদা করে ওষুধ খেলেই কি কাজ হয়, শরীর ফিরিয়ে দেয়। চিকিৎসাবিদ্যায় নিজের ওপর আস্থা বড় কম ছিল না। বলছেন—"এক এক সময় আমার মনে হয় আমি যদি ইচ্ছে করতুম তাহলে ভাল ডাক্তার হতে পারতুম। ডাক্তারের

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ— মৈত্রেয়ী দেবী, পৃঃ ১২৯

একটা ডাক্তারী instinct থাকা চাই। শুধু জানা আর experience নয়, instinct।" আমার মনে হতো আমার সেটা আছে। কারও অসুখ করেছে শুনলে যতক্ষণ না তার একটা ব্যবস্থা হয় আমি তো নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। কবির বয়স এখন ৭৮। কানে কম শোনেন। চোখে কম দেখেন, তবুও চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলন চলেছে। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন—"আজ আমি Tissue medicine পড়ব, আর ওই ছোট মেটিরিয়া মেডিকা, অনেক দিন দেখিনি, দরকার হয় মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নেওয়া, নৈলে একেবারে মনে থাকে না।"

মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন—"কারও অসুখ করেছে খবর পেলে সমস্ত ফেলে রেখে তার ওষুধের ব্যবস্থা করে তবে নিশ্চিন্ত হতেন,—সমস্ত দিনই চলত বই দেখা আর সিম্প্‌টম্ মেলানো।" একবার মৈত্রেয়ী দেবীর এক আত্মীয়ার অসুখের সংবাদে কবি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "তারপর বেরুলো মেটিরিয়া মেডিকা, বেরুলো 'টিস্যু মেডিসিন'—সমস্ত দিন ধরে সেই দূর দেশের স্বল্প পরিচিত একজনের অসুস্থতার দুঃখ তাঁর সমস্ত দিনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজের চাইতেও বড় হয়ে উঠলো।"

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কিছুদিন কবির সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি লিখছেন[১] "সকলেই জানেন আশা করি যে, তাঁর ভীষণ একটা ডাক্তারির ঝোঁক ছিল—রোগতত্ত্ব, ভেষজতত্ত্ব ও পথ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন ভালো বই পেলেই সংগ্রহ করতেন, পড়তেন। একটা বায়োকেমিক ওষুধের বাক্স ছিল—ঐসব বই এবং ঐ বাক্স সর্বদা তাঁর কাছে থাকতো। নিজেও যখন-তখন দু-এক বড়ি মুখে ফেলতেন,

১ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১১৪

অন্যদেরও খাওয়াতেন একটু কোন উপলক্ষ্য হলেই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ তাঁর কাছে চিকিৎসার্থী হলে, কি দারুণ খুশী যে হতেন, সে বলে বোঝানো যাবে না! বলতেন, আমি শুধু কবি নই, কবিরাজও!"

'রবীন্দ্রস্মৃতি'তে[১] লিখেছেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী—"বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসও তাঁর ছিল যথা, হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক। নিজে অনেককে ওষুধ দিতেন এবং তাতে উপকার হয়েছে শুনলে খুব খুশী হতেন, কাকিমার শেষ অসুখে এক হোমিওপ্যাথি ধরে রইলেন ও কোনো চিকিৎসা বদল করলেন না বলে কোনো কোনো বিশিষ্ট বন্ধুকে আক্ষেপ করতে শুনেছি।"

কবি-জায়া মৃণালিনী দেবী শুনেছি মারা যান যক্ষ্মারোগে। তখনকার দিনে যক্ষ্মারোগকে লোকে বলতো 'শিবের অসাধ্য ব্যাধি।' সেই ব্যাধির চিকিৎসা হয়েছিল হোমিওপ্যাথি মতে। কবি নিজেই চিকিৎসা করেছিলেন কিনা এখানে সেটা স্পষ্ট নয়। যাই হোক হোমিওপ্যাথির ওপর তাঁর যে বিশেষ আস্থা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। বায়োকেমিক তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন। তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে বায়োকেমিকের কথাই বেশী উল্লেখ আছে।

কবি যে অপরের অসুখেই ওষুধের ব্যবস্থা করতেন, তা নয়। নিজের চিকিৎসাও নিজে করতেন অনেক সময়। শ্রীমতী মহলানবীশকে[২] লিখছেন—"—এখনো তোমার জ্বর চলচে, আমারো

---

১ রবীন্দ্রস্মৃতি—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, পৃঃ ৬৪

২ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের স্ত্রী শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত পত্রসংখ্যা ৪৪১, তা ২, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

চলত ঠিক তোমার মত যদি ডাক্তারি মতে চলতুম। আমি নিজের চিকিৎসা নিজেই করেছি, সকালে বিকেলে লাইকোপোডিয়ম ৩০ দুদিন খেলুম—ভেবেছিলুম লাইকোপোডিয়ম ২০০ × খেতে হবে। কিন্তু তা আর হোলো না—দুদিন দু ডোজে আমার জ্বর গেল আর এ পর্যন্ত এলো না। অবশ্য আমার ঐ ওষুধের লক্ষণ ছিল—বিকেলের দিকে বাড়ত, রাত্রে হোত উপশম। বুঝেছিলাম এটা যকৃতের গোলমাল। —তোমার শরীরতন্ত্রের কোন্ মহলে কল খারাপ হয়েছে তা তো জানিনে—খুব সম্ভব লিভারে। মুখ যে-রকম তিতো হচ্ছিল বোঝা যায় ওটা পিত্তের বিকৃতি। Kali Mur, Nat Sulf দিয়েছিলুম সেই লক্ষণ দেখে, ম্যালেরিয়ায় Nat Sulf প্রধান ওষুধ —তাঁর সঙ্গে Fer Phos।

১৯৪০ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। কবি এলেন কালিমপঙ্। উঠলেন গৌরীপুর ভবনে। ২৬ শে সেপ্টেম্বর। শরীরটা ভাল নয়। রাত্রি ৯টা, 'নির্বাণ'-এ প্রতিমা দেবী লিখছেন[১] —আমাকে ডেকে ডেকে বললেন—"বউমা, আমি এইবার শুতে যাই, তুমি বায়োকেমিক ওষুধগুলো রাতের মত আমার টেবিলে রেখে যেয়ো।" রাত্রে প্রতিমা দেবীর ঘুম ভেঙে গেল, ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেন কবি ইজিচেয়ারে বসে আছেন, সামনে কয়েকটা ওষুধের শিশি। বললেন—"ভালো না।" আর একটা বায়োকেমিক ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুলেন। তবে একথাও ঠিক নয় যে সব সময়ই তিনি নিজের চিকিৎসা নিজেই করতেন। শ্রীমতী মহলানবীশকে লেখা পত্রে জনৈক ডাঃ জীবন রায়ের নাম পাওয়া যায়[২]। তাঁর চিকিৎসার

১ নির্বাণ—শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর (কবির পুত্রবধূ), পৃঃ ১৩—১৪।

২ পত্রসংখ্যা ১৭৬, তা ২৩।৪।৪০

ওপর কবির আস্থা ছিল বলেই মনে হয়। কবি লিখেছেন "ডাক্তার জীবন রায়ের একটি চিকিৎসা-বিধান অনুসরণ করে ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরের সহস্রক শক্তির এক শিশি সঙ্গে এনেছিলুম। তাঁর যে উপদেশ পেয়েছিলুম আমার স্মৃতিপটে সেটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অল্প একটু মনে আছে, পরে পরে চার দিন সেবন করতে হবে, কিন্তু তারপর সব অন্ধকার। সহস্রক শক্তির ওষুধ তিন দিন খেয়ে মনে হোল যে হয়তো ভুল শুনেছি—তাই স্তব্ধ হয়ে আছি, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করে যদি কর্তব্য নির্দেশ করে দাও তাহলে আবার সাহস করে লাগব।" ডাঃ ওষুধ খাওয়ার যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কবি সেটা ভুলে গেছেন। তাই শ্রীমতী মহলানবীশকে লিখছেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থাটা তাঁকে জানাতে। এর কয়েক মাস পরে লেখা[১] একখানা চিঠিতেও ডাঃ জীবন রায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি লিখছেন, "জীবন আমাকে সাত দিনের ওষুধ পাঠিয়েছে, খেতে রাজী আছি। কিন্তু জানিনে কী লক্ষ্য করে তার এই ওষুধ। —আমাকে চিন্তিত করেছে। আমার দৃষ্টি—তার জন্যে Silacia, Nat, Mur, Calc, Fenor খেয়ে থাকি।— কিন্তু চক্ষু বন্ধ করে আর কোনো রোগের দিকে দৃষ্টি দেবার উৎসাহ আমার নেই। তবু[২] কথা দিচ্ছি কাল থেকে জীবনের ওষুধ চালাব।" শ্রীমতী মহলানবীশের কথায়—"কারো অসুখ হয়ে কষ্ট হচ্ছে এখবর পেলে কিছুতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। ...বার বার আমার চিঠিগুলোর মধ্যেই তার প্রমাণ ·।" চিঠিখানা থেকে মনে

১ পত্রসংখ্যা ৪৮৫, তা ২৪।৭।৪০

২ পত্রসংখ্যা ৪৭৭, তা ২৭।৪।৪১

ডাঃ জীবনময় রায় চিকিৎসক ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক।

হয় শ্রীমতী মহলানবীশের ফোড়া হয়েছিল। এই সংবাদ পেয়ে কবি লিখছেন—"আমার চিকিৎসাবিধান অনেকবার তুমি মেনেছ, আর একবার মানলে ঠকবে না।

অবিলম্বে বায়োকেমিক ক্যালকেরিয়া সালফ দুই এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করবে। একটুও ভয় কোরো না। তোমার অবস্থাটা ঠিক জানতে পারলে ওখানে থাকতেই ওষুধটা খাওয়াতুম। যদি ফাটে তবুও খেয়ো, ঠিক সময়ে ওষুধ পড়লে ফাটা বন্ধ হয়ে যাবে।" কয়েক দিন পর আর এক খানা চিঠি লিখছেন[১]—"তোমার জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন আছে। ইতিপূর্বে বেলঘরিয়ার ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম……। আমি তোমাকে কিছু ঘনঘন Calcaria Sulf 6 খেতে পরামর্শ দিয়েছিলুম।" কয়েক মাস পরে পুনরায় লিখছেন[২]—"তোমার সম্বন্ধে জনশ্রুতি সন্তোষজনক নয়। তুমি জানিয়েছ Calc Sulf তোমার পক্ষে অকার্যকরী। এটা অশাস্ত্রীয়। Silaciaর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে পারো।"

কবি যে পরামর্শ দিতেন তার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকতো। কেবলমাত্র দুটো উপদেশ দিয়ে দায় এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। কখন্—কি অবস্থায়—কোন্ ওষুধ খেতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার নির্দেশ দিতেন। শ্রীমতী মহলানবীশকে লিখছেন[৩]—"দূর থেকে চিকিৎসা করা শক্ত। আন্দাজে যেটুকু বলা যায় সে হচ্ছে—পেটের বেদনার জন্যে Mag Phos। অজীর্ণ প্রভৃতির জন্যে Kali Mur ও Natrum Phos (অম্লর লক্ষণ থাকলে)। পেটে যদি ulcer

১ পত্রসংখ্যা ৪৭৯, তা ১৪।৫।৪০

২ পত্রসংখ্যা ৪৮৮, তা ২০।৯।৪০

৩ পত্রসংখ্যা ৪৪৯, তা ৩।১২।৩৮

আশঙ্কা করো তবে Silacia। জ্বর যদি থাকে তবে Fer Phos ও Kali Sulf, Mag Phos কলিক ব্যথায় ঘন ঘন প্রযোজ্য—acute অবস্থায় ১৫।২০ মিনিট অন্তরও চলে। Cali Mur ও Natrum Phos এক সঙ্গে মিলিয়ে দিলে ক্ষতি নেই।" কে বলবে এটা একজন প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র নয়? পরের চিঠিতে পুনরায় লিখছেন[১] তোমার চিঠি পড়ে দুটি কারণে আমার অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয়েচে। "১ম—তোমার ধারণা হয়েচে আমার চিকিৎসা-প্রণালী তুমি আয়ত্ত করেছ। তাতে রোগীদের অবস্থা কী হবে সে কথা আমি চিন্তা করিনে—কিন্তু আমার সঙ্গে মোলাকাতের একটা পথ ছিল সেটা বন্ধ হোলো।" কবির এই রকম রসিকতার তাৎপর্য কি ঠিক বুঝা যায় না, শ্রীমতী মহলানবীশ হয়তো নিজেই কোন ওষুধের ব্যবস্থা করে থাকবেন।

পূর্বে আর একখানা চিঠিতে দেখতে পাই শ্রীমতী মহলানবীশকে লিখছেন[২]—"—কুইনিন খেতে হয় খেয়ো। কিন্তু সেই সঙ্গে Fer Phos ও Nat Sulph খেলে কোনো ক্ষতি নেই বরং উপকার হতেও পারে, ইতিমধ্যে এই ওষুধে নবকুমার দ্রুত উপকার পেয়েছে। এমন আরও দু-একটা দৃষ্টান্ত আছে।" অপর একখানা চিঠি থেকে বুঝা যায় শ্রীমতী মহলানবীশের 'Glandular Swelling' হয়েছে। সেই সংবাদ পেয়ে কবি ব্যবস্থা দিচ্ছেন—"শাস্ত্রে বলচে Kali Mur is the Principal remedy in glandular swellings. তারপরে কথিত আছে Sero fulous enlargement of the glands এর জন্যে Calcarea Phos। অতএব আমার বিধান উক্ত

১ পত্রসংখ্যা ৪৫০, তা ১১।১২।৩৮

২ পত্রসংখ্যা ২৬৫, তা ৭ই বৈশাখ ১৩৪১

দুই ওষুধ পর্যায়ক্রমে খাওয়া। জীবনের পরামর্শ নিয়ে যথাকর্তব্য স্থির কোরো। তোমার gland যদি পাকবার লক্ষণ দেখায় তাহলে অন্য ওষুধের সহযোগে Silacia সেব্য। যদি glands খুব শক্ত হয় তাহলে Cal Fluor." চিকিৎসাশাস্ত্রে শুধু যে তাঁর জ্ঞান ছিল তাই নয়—অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট ছিল। এই চিঠিতেই লিখেছেন[১]—"বৌমার জ্বর আমার বিশ্বাস আমার ওষুধে সেরেচে। প্রথম দিনেই গেছে গায়ের ব্যথা, দ্বিতীয় দিনে জ্বর। এখবরটা তোমাকে দেওয়ার তাৎপর্য আমার চিকিৎসায় তোমার শ্রদ্ধা হবে, ওষুধ সম্বন্ধে মন্ত্রবচন —শ্রদ্ধয়া গ্রাহ্যং।"

অধ্যাপক মহলানবীশ অসুস্থ। সেই সংবাদে শ্রীমতী-মহলানবীশকে লিখছেন[২]—"তোমার ঘরের খবর তো একটুও ভাল নয়। প্রশান্তর যে চিকিৎসাই চলুক না, তার সমান্তরালে বায়োকেমিক ফেরাম ফস ও কেলিসানক পালাক্রমে এক ঘণ্টা অন্তর দিয়ে দেখতে পারো। বড় জোর যথোচিত ফল না হতে পারে, কিন্তু এই খুদে বড়ি কয়টিতে পালোয়ানি চিকিৎসা বিধ্বস্ত করতে পারে না, আমি জানি জীবন (ডাঃ জীবন রায়) এরকম দ্বৈরাজ্য সইতে পারে না—কিন্তু আমাদের দৈহিক জীবনে বহুরাজকতা আহার বিহার নানা উপলক্ষে সর্বদাই ঘটচে সেই জন্যে আমি বিরুদ্ধ পক্ষের গা ঘেঁষে চলতেও কুণ্ঠিত হইনে। ডাক্তার হিসাবে তাতে মর্যাদা লাঘব হতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমার উপাধি সাহিত্য-ডাক্তার সেই হেতু আমার লজ্জা নেই।" মনে হয় অধ্যাপক মহলানবীশের অসুখ এবার একটু স্থায়ী হয়েছিল, কেননা প্রায়

১ পত্রসংখ্যা ২০৯, তা ১৫ই মার্চ ১৯৩৪

২ পত্রসংখ্যা ৪১৯, তা ১০।২।৩৮

ছমাস পরে লেখা একখানা চিঠিতে কবি পুনরায় শ্রীমতী মহলানবীশকে লিখছেন[১] "......প্রশান্তর জ্বর যদি বেলা চারটে থেকে সন্ধ্যা অটটা পর্যন্ত প্রবলতা পায় তাহলে হোমিওপ্যাথি লাইকোপোডিয়ম ৩০ × দিতে পার, যদি জ্বরের বা গ্লানির সময়টা হয় সকালে দশটা এগারোটা, তাহলে হোমিওপ্যাথি নেট্রম ম্যুর, বায়োকেমিকটা বন্ধ কোরো না—আধঘণ্টা অন্তর পালা করে ফেরম ফস ও কেলি সলফ্ দেবে—সকালের দিকে কেলি ফস্।" এর পূর্বেও অধ্যাপক মহলানবীশের অসুখ সংবাদে পরপর কয়েকখানা চিঠিতে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। "রানী, প্রশান্তর খবর শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। কিছুকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে ব্যামোর সঙ্গে লড়াই শুরু হলে তার যেন অন্ত পাওয়া যায় না। চিকিৎসাও রকম বেরকমের......"[২] "প্রশান্তর শরীর সম্বন্ধে তুমি যা লিখেচ সেটা ভালো শোনাচ্ছে না। শরীর ভাঙতে আরম্ভ হলে তাকে ঠেকানো শক্ত হয়। প্রশান্তর শরীর এ পর্যন্ত ভালোই ছিল, রোগের সঙ্গে বোঝাপাড়া করতে হয়নি—সেইটেই হয়েচে মুস্কিল। ব্যামো জিনিসটাও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। তার ফল হয় একদিন তাকে বিশ্বাস না করে আর চলে না।"[৩]...... "প্রশান্ত কেমন আছে খবর দিয়ো। ওকি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগচে? ব্যামোর প্রকৃতি কি ধরতে পেরেচ? আমার তো মনে হয় কিছুদিন আমাদের বোটে গিয়ে যদি থাকো তাহলে উপকার পেতে পারে।"[৪]

---

১ পত্রসংখ্যা ৪২৪, তা ৪।৪।৩৮

২ পত্রসংখ্যা ২০৪, তা ২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

৩ পত্রসংখ্যা ২০৬, তা ১২ই ভাদ্র, ১৩৩৮

৪ পত্রসংখ্যা ২০৭, তা ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৮

মীরাদেবীর কন্যা বুড়ী। বুড়ীর পরীক্ষা। মীরাদেবী তাকে নিয়ে গেছেন কোলকাতায়। বুড়ীর মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। কবি চিন্তিত। শ্রীমতী মহলানবীশকে লিখছেন[১] "বুড়ীর পরীক্ষা উপলক্ষে তাকে মীরা আজ কোলকাতায় নিয়ে গিয়েছে। তোমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে। ওকে মনে করিয়ে দিয়ো বুড়ীকে যেন প্রতিদিনই দিনে তিনবার করে Kali Phos খাওয়ানো হয়—তা ছাড়া একবার করে Calcarea Phos ওর মাথা ঘোরার উপসর্গ আছে, পরীক্ষার পীড়নে খুবই স্নায়ুর উপর টান পড়বে। আমার এই ওষুধে নিশ্চয় উপকার হবে। বিশ্বাস না করেও যেন খাওয়ায়।" মেয়ের অসুখের কথা, তাকে ওষুধ খাওয়ানোর কথা মাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। নাত্‌নীর জন্যে দাদামশায়ের মনে কতখানি উদ্বেগই না দেখা দিয়েছিল!

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখছেন[২] "তোমার অস্ত্রঘটিত রোগটা কী রকমের, গরমের সময় অস্ত্রোপচার না করে শীতের অপেক্ষা করো। সুযোগ্য ডাক্তারের দ্বারা এ সময় হোমিওপ্যাথিক কিংবা বায়োকেমিক চিকিৎসার পরীক্ষা করা ভালো। অন্ত্রে যদি ক্ষত থাকে তবে Calcarea Sulf 6 × পাঁচটা বড়ি দিনে চার বার খেয়ে দেখতে পারো—নিরীহ ওষুধ অথচ যথার্থ ক্ষেত্রে উপকারের শক্তি তার প্রবল।" অনেকে মনে করতে পারেন কবির এই চিকিৎসার চর্চা হয়তো পরিণত বয়সে সুরু হয়ে থাকবে। কিন্তু তা নয়। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে একখানা চিঠিতে লিখছেন[৩]..."আবার

১ পত্রসংখ্যা ২৬০, তা ৭ই মার্চ, ১৯৩৪

২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১০৩

৩ চিঠিপত্র ১ রবীন্দ্রনাথ—পত্রসংখ্যা ১, তা জানুয়ারি, ১৮৯০

ইনস্পেক্টরের গলা ভেঙ্গে গেছে বলে তাকে হোমিওপ্যাথি ওষুধও দিয়েছি—এতে অনেক ফল হতে পারে—তার গলা ভাঙ্গা না সারলেও মনটা প্রসন্ন হতে পারে।" কবির বয়স তখন মোটে ২৯ বছর। লিখছেন জমিদারি সাহাজাদপুর থেকে। শান্তিনিকেতনের তখন প্রথম যুগ বলা চলে। সীতা দেবী গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। তিনি লিখছেন[১] "তিনি যে আবার চিকিৎসকের কাজও করেন তাহা আগে জানিতাম না। তাঁহার পাশে দেখিলাম একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স। তিন-চার মিনিট পরে পরে এক একজন রোগী আসিয়া জুটিতে লাগিলেন এবং ঔষধ লইয়া যাইতে লাগিলেন। কাহারও মাথা ধরিয়াছে কাহারও গলা ভাঙিয়াছে, কাহারও জ্বর, কাহারও পেটের গোলমাল।" একদিন মাঝরাতে শ্রীমতী রানী চন্দের শিশুপুত্রের কান্না শুনে কবি ওষুধপত্র সমেত এসে হাজির। শ্রীমতী চন্দ লিখছেন[২] "ছয় মাসের শিশু অভিজিত একদিন হঠাৎ মাঝরাতে দারুণ কান্না জুড়ে দিল।......খানিক বাদে দরজার কাছে গুরুদেবের ডাক শুনি,...খোকার কান্না শুনে বাইরে বেরিয়ে ভৃত্য বনমালীকে উঠিয়ে বাতি জ্বালিয়ে বায়োকেমিকের বাক্স থেকে বেছে ওষুধ নিয়ে নিজে এসেছেন। বললেন বোধহয় ওর পেটে ব্যথা হচ্ছে কোনো কারণে—কান্নার সুরে সেই রকমই মনে হল; এই ওষুধটা খাইয়ে দে দেখিনি।"

শ্রীপ্রমথ বিশী মহাশয় দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তিনি

---

১ পুণ্যস্মৃতি—সীতাদেবী, পৃঃ ৬৪
পত্রগুলি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা, 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
২ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রানী চন্দ, পৃঃ ১১

লিখছেন[১] "রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসার বাতিক ছিল, এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁহার দক্ষতাও ছিল। আশ্রমের কাহারও অসুখ হইয়াছে শুনিলে আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে ঔষধ পাঠাইয়া দিতেন। অন্যত্র রোগী চিকিৎসক খুঁজিয়া বেড়ায়, এখানে চিকিৎসক রোগী খুঁজিয়া বেড়াইতেন।" প্রথম যুগে কবিরাজীর দিকেও তাঁর ঝোঁক এসেছিল। প্রমথ বাবুর কথায়—"তাঁহার আবার এক একটা ঔষধের উপর খুব বেশি ঝোঁক ছিল। 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন' নামে একটা পাঁচনের উপর তাঁহার আস্থার অবধি ছিল না। এটা তাঁহার কাছে মকরধ্বজের ন্যায় সর্বরোগের ছিল বলিলেও চলে। সকালবেলা হাসপাতালে এই পাঁচন প্রচুর তৈরি হইত, সকল ছাত্রের পক্ষেই ইহা অবশ্য পানীয় ছিল।" পরবর্তীকালে অবশ্য ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

শ্রীসুধীর কর মহাশয় তাঁর 'কবিকথা'য়[২]—"কবির বাতিক ছিল বায়োকেমিক। ওষুধ পরকেও বিলাতেন, কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ওর ব্যবহার-পদ্ধতিটাই ছিল দেখবার মতো। হাতের কাছে টেবিলের উপর সাজানো থাকত অষ্টপ্রহর শিশিগুলো, খানিকক্ষণ পরে পরেই বাঁ হাত উপুড় করে নিয়ে ডান হাতের তেলোয় ঠুকে মুখে পুরতেন ঐ শিশি থেকে চার পাঁচটি করে সাদা গুটিকা। শারীরিক পটুতা, মস্তিষ্কের স্নায়ু-সবলতা কতটা রক্ষিত হত তিনিই জানেন, কিন্তু উঠতে বসতে ঐ বায়োকেমিকই নিয়েছিল টেনে তাঁর বিশ্বাস ও অধ্যবসায়।" শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখছেন[৩] "তাঁর

১ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—শ্রীপ্রমথ বিশী, পৃঃ ১৪১

২ কবিকথা—সুধীর কর, পৃঃ ২৪

৩ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৯

হাতের কাছে সর্বদাই থাকতো কালো মরক্কো-মোড়ানো একটি ওষুধের বাক্স ও দু-একটি চিকিৎসার বই। সময় অসময়ে দু-এক বড়ি করে নিজে খেতেন, অন্যকেও দিতেন। ওষুধ চাইতে এলে তাই তিনি অতিশয় খুশী হতেন।"

প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং লেখক পশুপতি ভট্টাচার্য "চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন[১]— "তাঁর ঘরে দেখলাম, হোমিওপ্যাথির কয়েকটা মোটা মোটা বই আছে। প্রত্যহ সকালে দেখতে পেতাম অনেক রোগী তাঁর দরজায় এসে জড় হয় ওষুধ নিতে। একদিন দেখলাম, আশ্রমের একটি ছেলের ইরিসি-পেলাস হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে ওষুধ দিচ্ছেন। ব্যাপারটা নিতান্ত সামান্য হয়নি, কিন্তু কয়েক দিন বাদে দেখলাম, ছেলেটি সেরেই গেল।......একদিন শেষে আমারই হ'ল অসুখ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এবার ডাক্তারের ওপর ডাক্তারি করতে হবে। তুমি আমার ওষুধ খেয়ে দেখ, নিশ্চয়ই সেরে যাবে। বিশ্বাস ক'রে তাঁরই ওষুধ খেলাম, এবং তারপর আমার অসুখও সেরে গেল। হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক ওষুধের দ্বারা তিনি চিকিৎসা করতেন। কিন্তু তাঁর নিজের ঔষধ নির্বাচনের প্রতি খুবই আস্থা ছিল। আর যখন দেখতেন যে ওষুধে ফল হয়েছে, তখন সে কি তাঁর আনন্দ!

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' পেলেন রবীন্দ্রনাথ। বললেন— 'এতদিন ছিলাম কবিরাজ, এখন হোলাম ডাক্তার'; কবিরাজ শব্দটি অবশ্য তিনি কবি-রাজ অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু আশ্রমের প্রথম দিকে ছাত্রগণকে প্রত্যেক দিন সকালবেলা 'পঞ্চতিক্ত

১ শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃঃ ৮৫৭-৫৮

কষায়' বলে একটি টনিকজাতীয় ওষুধ খেতেই হোতো। এ ওষুধটা সম্ভবতঃ কবিরাজী মতে কবিরই আবিষ্কার।

"রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার ছিলেন এটি ভুল তথ্য নয়। চিকিৎসায় তাঁর কুশলতার কথা তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি। খুব কঠিন এবং দুরারোগ্য অনেক অসুখ তিনি তাঁর চিকিৎসায় সারিয়েছেন—এ কথাও তাঁরি মুখে শোনা।" লিখেছেন শ্রীপরিমল্ গোস্বামী।[১]

শান্তিনিকেতনের পাশেই সাঁওতালপল্লী। কলেরা দেখা দিয়েছে সেখানে। একটি ছেলের মা এসে উপস্থিত। তার ছেলের কলেরা হয়েছে, ওষুধ চাই। কবি ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে চাইলেন। না, সে রাজী নয়। কবির ওষুধই সে চায়। দুটি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন কবি। উপদেশ দিলেন কি ভাবে খাওয়াতে হবে। ছেলে সেরে গিয়েছিল এই ওষুধে।

কেবল ওষুধের ব্যবস্থাই করতেন কবি তাই নয়। পথ্যের ব্যবস্থাও দিতেন। বিদ্যাসাগর হলের দ্বারোদ্ঘাটন। গিয়েছেন মেদিনীপুর, একটি রোগা ছেলেকে দেখে বললেন—"মাড়-ভাত খাও। ......আমি রোগীদের বায়োকেমিক ওষুধ ব্যবস্থা করার সঙ্গে মাড়-ভাতও খেতে বলি।"[২]

১৭ই পৌষ, ১৩২৫ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—"ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আসচি,......আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাসপাতাল প্রায় শূন্যই পড়ে আছে—এমন কখনও হয় না—তাই

১ যুগান্তর সাময়িকী, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭০

২ আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দমেলা, ২২শে বৈশাখ, ১৩৭০

মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণে হয়েচে।[১] বাংলা ১৩২৫ সনে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল।"

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন ১৩৩৪ সালে। তিনি লিখছেন[২] "কবিগুরু বায়োকেমিক ঔষধে বিশ্বাসী ছিলেন—এ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন। নিজেও সে ঔষধ খেতেন এবং অন্যের জন্য ব্যবস্থা করতেন।······রোজ বিকেলে আমার মাথা ধরে শুনে আমার জন্য নিজের হাতে লিখে একটা ঔষধ ব্যবস্থা করে কোথায় পাওয়া যায় তাও বলে দিয়েছিলেন।" মধ্যমা কন্যা রেণুকা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। কবি তাকে নিয়ে গেলেন আলমোড়ায়। বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে কলকাতায় আসতে হোলো। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলেন রেণুকার অসুখ বেড়েছে। আলমোড়ায় পৌঁছে বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন, মধ্যমা কন্যা রেণুকা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। কবি তাকে নিয়ে গেলেন আলমোড়ায়। বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে ক'লকাতায় আসতে হোলো। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলেন রেণুকার অসুখ বেড়েছে। আলমোড়ায় পৌঁছে বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন[৩] "—বন্ধু, রেণুকার সংশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এরূপ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Stychnine ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোনমতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবার চেষ্টায় ছিল।·····আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া

১ চিঠিপত্র ৬—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬৮

২ যুগান্তর, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭০

৩ চিঠিপত্র ৫, ১৫ আষাঢ়, ১৩১০, পৃঃ ৫০

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে—কাশি কম, জ্বর কম, পেটের অসুখ কম, বিকারের প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে—বুকের ব্যথা নাই—বেশ সহজ ভাবে কথাবার্তা কহিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে—আশা করি এ ধাক্কাটা কাটিয়া গেল।” সে ধাক্কা অবশ্যই কেটেছিল। কারণ এর পর প্রায় তিন মাস রেণুকা বেঁচে ছিল। শ্রীমতী রানী চন্দ তাঁর ‘গুরুদেব’এ লিখছেন,[১] “বায়োকেমিক ওষুধ গুরুদেব পছন্দ করতেন খুব। এই ওষুধের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল তাঁর। যে বার গুরুদেবের রিসিপ্লাস হয়, আমি তখন কলকাতায়; আমার স্বামীর টাইফয়েড হয়েছে, ওঁকে নিয়ে ব্যস্ত। গুরুদেব একটু ভালো হয়েই লিখে পাঠালেন, অনিলের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। আমার বিশেষ অনুরোধ ওর টেম্পারেচার কমাবার জন্য ওকে আধঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে ফেরমফস্ ও কেলিসলফ্ খাওয়াস। তারপর টেম্পারেচার নামলে খাওয়াস নেট্রম সলফ্। ওকে অন্য যে-কোন ওষুধই খাওয়ানো হোক্, তার সঙ্গে এটা দিলে দোষ হবে না। রোজ পোস্ট কার্ডে খবর জানাস।” শ্রীমতী চন্দ আরও লিখছেন,[২]—“গুড়ি গুড়ি সাদা সাদা পিলভরা বায়োকেমিকের একগাদা শিশি থাকত গুরুদেবের সাথে সাথে। যেখানে যখন বসতেন বা লিখতেন শিশি সমেত ট্রেটা পাশে থাকা চাই। আর থাকত চিকিৎসার মোটা বইখানা, যখনই সময় পেতেন মন ঢেলে বইখানি পড়তেন আর তারই ফাঁকে এক একটা শিশি খুলে হাতের তেলোয় কতকগুলি পিল ঢেলে মুখে ফেলে দিতেন। কেউ যদি তার কোনো অসুখ বলে ওষুধ চাইতে

১ গুরুদেব—পৃঃ ৪৯

২ গুরুদেব—পৃঃ ৪৯—৫০

আসতেন, তাহলে গুরুদেব অত্যন্ত খুশি হতেন। অতি আগ্রহে ওষুধ ঢেলে দিতেন, বারে বারে তার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন রোগী কেমন আছে। ফিরে ফিরে ওষুধ বদলে বদলে পাঠাতেন। গুরুদেবের গানের বা কবিতার প্রশংসার চেয়ে হাজার গুণ খুশি হতেন তিনি যদি কেউ এসে বলত যে গুরুদেবের ওষুধে তার অমুখ অসুখটা সেরে গেছে। গুরুদেবের সেই খুশিভরা মুখ দেখবার মতো ছিল। অনেক সময়ে এমনও হত, গুরুদেবকে খুশি করবার জন্য হঠাৎ পেট ব্যথা মাথাধরা নিয়ে গুরুদেবের কাছে কেউ কেউ উপস্থিত হতেন, আর গুরুদেবের ওষুধ খেয়ে তখুনি তখুনি ভাল হয়ে যেতেন। গুরুদেব বুঝেও না বুঝার ভাণ করতেন, বরং প্রসন্নই হতেন। ওঁকেও (স্বামী অনিলচন্দ) কতবার দেখেছি এমনি, কোনো একটা কাজে গাফিলতি করেছেন, জানেন কপালে বকুনি আছে আজ, তাড়াতাড়ি গিয়ে সর্দি কাশি এটা ওটা বলে গুরুদেবের কাছে দাঁড়িয়েছেন, গুরুদেব ওষুধ দিয়েছেন, মুঠোভরা সে ওষুধ মুখে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।”

১৩১৮ সালের চৈত্রমাসে শিলাইদহ থেকে কবি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলাকে একখানা চিঠিতে[১] লিখছেন, “তোর জন্যে আমার একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ মনে পড়চে একবার চেষ্টা করে দেখবি? Sulphur 200—এই চিঠির মধ্যে এক পুরিয়া পাঠাচ্ছি। বিকেলে তোর যে হাত পা জ্বালা করে জ্বর জ্বর বোধ হয় সেটা এতে সারবে বলে আমার বিশ্বাস। যদি খেয়ে উপকার বোধ করিস্ তবে আমাকে বলিস্ আবার ৮।১০দিন পরে আর একবার দেব।” ১৯১৩ সাল। কবি লণ্ডনে। কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর পুত্রের Eczema

১ চিঠিপত্র, ৪র্থ—পৃঃ ১

সম্পর্কে মীরাদেবীকে লিখছেন,[১] "ওর Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস্। ডাক্তারি বই দেখলেই জানতে পারবি Eczema বসে গেলে শরীর ভারি অসুস্থ হয়—অল্পেতেই অসুখ বিসুখ করতে থাকে। এই জন্যে তাড়াতাড়ি Eczema সারানো ভাল নয়। Sulphur 200 আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস্। তারপরে আবার একমাস অপেক্ষা করে আবার খাওয়াস্। Eczema যদি বসে গিয়ে থাকে তবে Sulphur-এ সেই দোষ নিবারণ করবে।" ১৯৩২ সাল। মীরাদেবীর পুত্র নিতু (নীতীন্দ্র) জার্মানিতে। তাঁর হঠাৎ অসুখের সংবাদ পেয়ে মীরাদেবী জার্মানি যাত্রা করেছেন। কবি তাঁকে লিখছেন,[২] "স্যানাটোরিয়মের আইন কানুন কী রকম জানিনে। সেখানে বায়োকেমিক চিকিৎসায় ওরা কি মত দেবে না! আমার বিশ্বাস, যখন ঘন ঘন কাশি বা অন্য কোনো উপদ্রব ঘটে তখন এই সব নিরীহ ওষুধে আশু উপকার পাওয়া যায়। নিশ্চয় শহরে বায়োকেমিক ডাক্তার আছে—অন্ততঃ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। দূর থেকে কিছু বলা যায় না—ভেবে চিন্তে দেখে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করিস্।"

১৩৪৩ সালে শান্তিনিকেতন থেকে মীরা দেবীকে লিখছেন,[৩] "বুড়ির (নন্দিতা) স্থান পরিবর্তনের জন্যে ডাক্তাররা যা পরামর্শ দেয় করিস্। ইতিমধ্যে ওর টন্‌সিলের জন্যে Calcarea Sulph 6x বায়োকেমিক, দিনে তিনবার করে দিস্। নিশ্চিত উপকার হবে।

১ চিঠিপত্র, ৪র্থ—পৃঃ ৫৬

২ চিঠিপত্র, ৪র্থ—পৃঃ ১৪৮

৩ চিঠিপত্র, ৪র্থ—পৃঃ ১৫৮

ভুলিস নে। ওর সম্বন্ধে ডাক্তাররা যা স্থির করবে নিশ্চয় কৃষ্ণ (কৃষ্ণ কৃপালনি—নন্দিতার স্বামী) তাতে আপত্তি করবে না। ওর জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে রইল।" মীরাদেবীকে আর একখানা চিঠিতে লিখছেন ১৯৩৭সালের ১৭ই মে আলমোড়া থেকে,[১]— "কাল সন্ধ্যে বেলায় কৃষ্ণ (মনে হয় কৃষ্ণ কৃপালনি) এসেছে। জ্যোৎস্নার খবর কী? বিকেলের জ্বরের পক্ষে Kali Sulph এবং Fer Phos ব্যবস্থা।" কিন্তু এ ব্যবস্থা যে কার জন্যে সেটা এখানে স্পষ্ট নয়। জ্যোৎস্নার জন্যে কি? জ্যোৎস্না হচ্ছেন শান্তিনিকেতনের জনৈকা প্রাক্তন ছাত্রী। হতে পারে। কারণ এর আগের চিঠিতে লিখছেন —"জ্যোৎস্নাকে কেমন দেখলি?" নাত্নি বুড়ি অর্থাৎ মীরাদেবীর কন্যা নন্দিতার কাছে খবর পেয়েছেন মীরাদেবী অসুস্থ। লিখছেন[২]—"কাল রাত্রে বুড়ির কাছ থেকে তোর অসুখের কথা শুনে মনটা ভারি উদ্বিগ্ন আছে। আজ থেকে কয়েক দিন এখানে বিয়ের হাঙ্গাম—সেটা না চুকলে আমাকে ছেড়ে দেবে না—এটা শেষ হলেই আমি কলকাতায় যাব। ইতিমধ্যে দিনে তিনবার পালা করে Kali Mur এবং Natrum Phos খাস—অবহেলা করিসনে।" মীরাদেবীর কন্যার নাম নন্দিতা—ডাকনাম বুড়ি। কবি আদর করে সময় সময় বৃদ্ধা বলে ডাকতেন। বৃদ্ধাকে একখানা চিঠিতে লিখছেন[৩]—"সুনীতের অসুখের খবরে মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, এলোপ্যাথিতে টাইফয়েডের ওষুধ নেই বল্লেই হয়—ওর গোড়া থেকে হোমিওপ্যাথি দেখালে কখনো বাড়াবাড়ি হত না বলে

---

১ চিঠিপত্র, ৪র্থ—পৃঃ ১৬৫

২ চিঠিপত্র, ৪র্থ—পৃঃ ১৬৮

৩ চিঠিপত্র, ৪র্থ—পৃঃ ২০০

আমার বিশ্বাস। সুনীত এখন কেমন আছে খবর দিস।" 'সুনীত' হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা। যে বার কালিম্পঙে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন সেই বারকার কথা। শরীর ভাল যাচ্ছে না। বেশ অসুস্থই বলা যেতে পারে। ডাঃ দাশগুপ্ত এসেছেন দেখতে। পেটে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছেন। এরকম উপসর্গ দেখা দিলে কবি নিজেই নিজের চিকিৎসা করেন। তাই বলছেন ডাঃ দাশগুপ্তকে,[১] "গোলমাল হলে আমি নিজেই একটু হোমিওপ্যাথি করি। হোমিও-প্যাথি ওষুধ আমার সঙ্গেই আছে। সচরাচর নাক্স ভোম্ খেলেই এ-সব যন্ত্রণা কমে যায় আমার, কিন্তু এবার নাক্স ভোম্ কিছু করছে না। না হলে বায়োকেমিক ক্যালিফস্ খেলেও আমার উপকার হয়। সেটাও খেয়েছি। কিন্তু তাতেও কিছু উপকার হয়নি। জেনে রাখো ক্যালিফস্‌টা Spasmodic Contraction এর জন্যে খুব ভাল ওষুধ।"

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রকথা'য়[২] লিখছেন, "তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করিতে মনস্থ করিলেন। ইলেকট্রো-আয়ুর্বেদ, হ্যানিমান প্রবর্তিত ও আধুনিক উন্নত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান, ডাঃ শুসলারের আবিষ্কৃত টিস্যু রেমিডী বা বায়ো-কেমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ-নৈপুণ্য অর্জন করিলেন। নিজ পরিবারে, জমিদারীর স্থস্থ প্রজাদের ও শান্তিনিকেতনের বালকদের চিকিৎসার ফলে, যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিলেন, তাহাই তাঁহাকে সুনিপুণ চিকিৎসকের মর্যাদা দিল। এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের পরিত্যক্ত

---

১ কালিম্পঙের দিনগুলি—পৃঃ ৬৮-৬৯

২ রবীন্দ্রকথা, পৃঃ ২৬৪

একাধিক কঠিন রোগগ্রস্তকে রবীন্দ্রনাথ সাহস ভরে নিজ হাতে লইয়া সুচিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।"

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একখানা চিঠি থেকে অনুমান করা যায় যে হেমন্ত বালা সম্ভবতঃ তাঁর স্নায়বিক অবসাদের কথা কবিকে লিখেছিলেন এবং তার উত্তরে কবি লিখছেন[১]—"আমি নিজের ডাক্তারি নিজেই করে থাকি। রোগের দুঃখটা আমাকেই ভোগ করতে হয় অথচ তার সুযোগটা অন্যে ভোগ করবে কেন? এক সময়ে বহু যত্নে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চা করেছিলুম। কিন্তু রোগের লক্ষণ এবং বহু বিস্তৃত ওষুধের ফর্দের মধ্যে এত বেশি হাতড়াতে হয় যে বইগুলো এবং ওষুধের বাক্সটা বিদায় করে দিয়েছি।- এখন বায়োকেমিকের আশ্রয় নিয়েছি—ফল পাই ভালো। মানসিক ক্লান্তিতে আমাকে ভুগতে হয়, তার সব চেয়ে ভালো ওষুধ Kali Phos 6x। তুমি যে স্নায়বিক অবসাদের কথা লিখেচ তাতে ঐ ওষুধটা খাটবে। সুবিধা এই যে উপকার যদি নাও করে অপকার করবে না। দিনে দশ গ্রেণ পরিমাণে চারবার করে খেয়ে দেখতে পারো। কবি ধরেচেন কবিরাজী এতে যদি হাসি পায় তো হেসো এবং হাসতে হাসতেই ওষুধ খেয়ে দেখো—বিশেষত যখন ওষুধটা বিস্বাদ নয়। পর্যায়ক্রমে আরও একটা ওষুধ ব্যবহার কোরো তার নাম Kali Mur 6x। অর্থাৎ একবার প্রথমোক্ত ওষুধ, তার দুঘন্টা পরে দ্বিতীয়টা। আমাকে ফি দিতে হবে না। আমার নিকটবর্তীদের উপরে চিকিৎসা চালাই—কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।"

---

১ চিঠিপত্র ৯—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৮৫, ২৭ আগস্ট, ১৯৩১

পরে আর একখানা চিঠিতে লিখছেন,[১] "তুমি জিজ্ঞাসা করেছ হোমিওপ্যাথির ল্যাকেসিসের সঙ্গে বায়োকেমিক ওষুধের বিরোধ আছে কিনা। বায়োকেমিক পক্ষের নেই, কিন্তু হোমিও-প্যাথি অন্যপন্থী ওষুধের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সেই কারণে, আমি বোধকরি যতদিন হোমিওপ্যাথি খাচ্ছ ততদিন অন্যসব ওষুধ বন্ধ রাখাই ভাল।"

হেমন্তবালা দেবী যে কবির কাছে অর্শ রোগের ওষুধের নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন উত্তরে কবি লিখছেন[২]—"Calcarea Fluor 6x (বায়োকেমিক), অর্শের একটা ভাল ওষুধ। রাত্রে হোমিওপ্যাথী নাক্স্ ভমিকা ৩০x এবং প্রাতে সালফর ৩০x উপকারে লাগতে পারে।"

হেমন্তবালা দেবী তাঁর মায়ের একজিমার জন্যে কবির কাছে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র চেয়ে পাঠিয়েছেন বলে মনে হয়। উত্তরে কবি লিখছেন,[৩] "তোমার মাকে বোলো তাঁর একজিমার ওষুধ কেলি সালফ্ ও নেট্রম ম্যুর, ৬ এর পর্যায়ে। Kali Sulf 6x, Natrum Mur 6x। এখানে (শান্তিনিকেতন) এসে আমার অনেকগুলি রোগী জুটেছে।"

---

১ চিঠিপত্র ৯—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৬১, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

২ চিঠিপত্র ৯—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৩৫, ১৭ই জুলাই, ১৯৩৭

৩ চিঠিপত্র ৯—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৯৭, ২০ মার্চ, ১৯৩২

ব্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্ধংকৃষিকর্মণি......" মহাজন বাক্য। মিথ্যা নয়। তবে লক্ষ্মী চঞ্চলা।

দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' হয়েছিলেন লক্ষ্মীর কৃপায়। লক্ষ্মী এসেছিলেন ব্যবসায়কে উপলক্ষ্য করে। কিন্তু এক পুরুষেই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথকে তাই বলতে শুনি, "আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।[১]"

পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কারবার সব বন্ধ হয়ে গেল। অবশিষ্ট রইলো জমিদারি। দেবেন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধি ছিল কিন্তু আসক্তি ছিল না। জমিদারির আয়ের উপর নির্ভর করে সারাজীবন ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পুত্রগণের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হন। প্রথমে পাট ও নীলের ব্যবসা আরম্ভ করেন, পরে ষ্টীমার। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,[২] "দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধকরি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। ......স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু এঞ্জিনে ও কামরায় নহে, ঋণে ও সর্বনাশে।......প্রতিযোগিতার[৩] তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের

১ আত্মপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭১

২ জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৪১-৪২

৩ প্রতিযোগিতা 'হোরমিলার' কোম্পানীর সহিত।

মূল্যটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল খুলনার স্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল।......জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকল প্রকার অভাব বাড়িল বই কমিল না।......যাত্রীরা যখন বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্মচারীরা যে তপস্বীর মত উপবাস করিতেছিল, এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই।" স্টীমার একখানা নয়, অনেকগুলি—সরোজিনী, ভারত, লর্ডরিপন, বঙ্গলক্ষ্মী ও স্বদেশী। শেষ পর্যন্ত এ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

এবার রবীন্দ্রনাথের পালা। তখন তিনি সপরিবারে শিলাইদহে। আরম্ভ করলেন নূতন নূতন ফসল ও রেশমের গুটির পরীক্ষা। আমেরিকান ভুট্টা ও মাদ্রাজি সরু ধানের চাষের পরীক্ষাও চলেছিল। ইতিপূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ায় 'ঠাকুর-কোম্পানী' নামে এক কারবার খোলেন। ভুষিমাল ও পাট কেনা বেচা এবং আখমাড়াইয়ের কল ভাড়া দেওয়ার কাজ তাঁরা আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ এই ব্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথও জড়িত হয়ে পড়েন। সুরেন্দ্রনাথ অন্য ব্যবসায়ের দিকে মন দিলেন। বলেন্দ্রনাথ যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বাসী ম্যানেজার ৭০।৮০ হাজার টাকার হিসাব গরমিল করে উধাও হলেন[১]। সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও দুবৎসর তিনি কারবার চালিয়েছিলেন বটে কিন্তু বহু টাকা তাঁকে ঋণ করতে হয়েছিল। তারপর ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে চলে আসেন।

১ রবীন্দ্রজীবনী—১ম, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫২

বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে পত্রালাপ থেকে বুঝা যায় প্রিয়নাথ বাবু ও ঐসময় ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কুষ্টিয়ায় কি ব্যবসা করা যেতে পারে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একাধিক পত্রে প্রিয়নাথ বাবুকে পরামর্শ দিচ্ছেন। একখানা পত্রে লিখছেন নদীর ধারে জমি কিনে গোলাপের ক্ষেত করার কথা। আর একখানা পত্রে বন্ধুর মাছের ব্যবসায়ের প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন।[১] প্রিয়নাথ বাবু শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যবসায়ে নেমেছিলেন কিনা সেটা জানা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ব্যবসায়—প্রচেষ্টা সম্পর্কে ৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন[২], ...রবীন্দ্রনাথও জ্যেষ্ঠের (জ্যেতিরিন্দ্রনাথের) পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কমলার চরণাশ্রিত হেমনলিনীর আকর্ষণে বাংলার কলকণ্ঠ পাপিয়া 'ভারতীর' কমলকুঞ্জ হইতে উড়িয়া আসিয়া পাটের ক্ষেতে বাসা বাঁধিবার আয়োজন করিল কিন্তু প্রতিকূল বায়ুতে সে আয়োজন ব্যর্থ হইল। 'যাও লক্ষ্মী অলকায় যাও লক্ষ্মী অমরায়' বলিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তিনি আজ হয়ত সেই অভিমানেই নিজের বসতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবসায়ীরূপে পাইয়াও অভিনন্দিত করিলেন না।......"শুধু পাট নয়, কোমল আলু ও কঠিন ইষ্টক—দুইই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আকৃষ্ট করিতেছিল ; কিন্তু আশা—বৈতরণী নদীর পারে যাইতে কোনও সাহায্য পাওয়া গেল না।" বলেন্দ্রনাথের 'স্বদেশ ভাণ্ডার' এবং যোগেশ চৌধুরীর 'ইণ্ডিয়ান স্টোর্সে'ও তিনি যোগ দেন। "কিন্তু এবারেও মিটিল

১ চিঠিপত্র—৮, পৃঃ ১৫৫, ১৫৭, ১৬৪

২ সওদাগর রবীন্দ্রনাথ, মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৬৯, পৃঃ ১০৫-৫১

না, বঁধু আসিলেন না, আসিল 'পিতামহী ভাগ্যদেবীর প্রচুর পরিহাস'। ফলে যথেষ্ট অনটন, বহু বিপদ ও মনক্ষোভ রবীন্দ্রনাথকে বরণ করিয়া লইতে হইল।" রবীন্দ্রনাথের ব্যবসায়ে ব্যর্থতা সম্বন্ধে খগেন্দ্রনাথ বলছেন, "ইহা বাংলা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির সৌভাগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। হয়ত সেখানে প্রশ্রয় পাইলে কবির অনধিকারচর্চার প্রসারই বৃদ্ধি পাইত।"

প্রিয়নাথ সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁকে লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে প্রায় চিঠিতেই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বন্ধুকে অনুরোধ জানাচ্ছেন কিছু টাকা ধারের ব্যবস্থা করে দিতে। এই টাকার পরিমাণ বিভিন্ন চিঠিতে বিভিন্ন রকম আছে। এমন কি ৫০,০০০ হাজার টাকার কথাও আছে। এর জন্য সুদ ১২৷৷০ পার্সেণ্টও দিতে প্রস্তুত। টাকার জন্যে বইএর কপিরাইট বিক্রী করতেও রাজী। এ থেকেই বুঝা যায় এই সময় অর্থাভাবে রবীন্দ্রনাথ কতখানি বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন।

অর্থাভাবের কথা প্রথম প্রকাশ পেয়েছে ১৮৮৪ সালে লেখা প্রিয়নাথ বাবুকে এক চিঠিতে। লিখছেন[১] "......অর্থাভাবে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে—সেইজন্যে চিঠির ভাবটা যদি কিছু রুক্ষ হয়ে থাকে ত আমাকে মাপ কোরো"—এর একবছর আগে বিবাহ হয়েছে। সন্তানাদি হয়নি। এস্টেট থেকে মাসোহারা পান। তবে অর্থাভাবের কারণ কি? কার কাছ থেকেই বা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে কিছুই প্রকাশ নেই।

পরের চিঠিতে কোনো তারিখ নেই। লিখছেন,[২] "অল্প টাকা হাতে পেয়েছিলুম কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ ধার শুধ্‌তে উড়ে গেছে। প্রতিদিনের খুচরা খরচ প্রায় ধার করে চালাতে হয়। জমিদারি থেকে এবার অল্প টাকা এসেছে—আর দশ পনেরো দিনে বাকি টাকা আসবার কথা আছে। যা হোক আমি দ্বিপুর[৩] কাছে ঐ

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৬, পত্রসংখ্যা ২৫

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৩৩, পত্রসংখ্যা ৩২

৩ দ্বিপু অর্থাৎ দ্বিপেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র।

তিনশো টাকা ধার করবার চেষ্টা দেখব যদি পাওয়া যায়।” তারিখ না থাকলেও, পূর্বের চিঠি দেখে মনে হয় এ চিঠি ১৮৮৬ সালে লেখা। তখন প্রথমা কন্যা বেলার জন্ম হয়েছে। সংসারে খরচ অবশ্যই কিছু বেড়েছে। কিন্তু শুধু তারই জন্যে ‘এ তিনশ টাকা’ টাকা ধার করবার আবশ্যকতা হয়েছিল কি ?

পরের চিঠিতেও কোনো তারিখ নেই। লিখছেন,[১] “অর্থাভাবে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই বইয়ের টাকা কি অল্পদিনের মধ্যে দিতে পারবে ? তাহলে বেঁচে যাই।” কোন্ বইয়ের টাকা ? পরের চিঠি, তারিখ নেই। লিখছেন,[২] “আমার সম্প্রতি টাকার নিতান্ত দরকার হয়েছে, যদি সুবিধে করে দিতে পার ত বেঁচে যাই।” এর পরের চিঠিতেও কোনো তারিখ নেই। লিখছেন,[৩] “......কাল যদি টাকাটা নিয়ে আহারাদির পর আসতে পার ত সুবিধে হয়। আমার উত্তমর্ণরা সব হাত পেতে বসে রয়েছে টাকাটা পেলেই কথামত বিলি করে দিয়ে বাঁচি।” “রবিবারে যাওয়া একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। অতএব টাকাটা আজই কিম্বা কাল বেলা দুটোর মধ্যে পেলে বড়ই সুবিধে হয়। কোনোমতে জোগাড় করে দিতে পার না ? কাপড় চোপড় কর্ত্তে অনেক ধার হয়ে গেছে, এই সময়ে না পেলে বিদেশে বড় মুস্কিল হবে,[৪] “—লিখছেন আর একখানা চিঠিতে। এতেও তারিখ নেই। ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, ভাগ্নেয় প্রভৃতি নিয়ে কবি দার্জিলিঙ যান।

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৩৪, পত্রসংখ্যা ৩৪

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৩৫, পত্রসংখ্যা ৩৫

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৩৫, পত্রসংখ্যা ৩৬

৪ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৪০, পত্রসংখ্যা ৪০

এখানে 'বিদেশ' বলতে কি দার্জিলিঙ এর কথা বলেছেন? আর একখানা চিঠি[১] "ঋণ ব্যাপারের আদ্যোপান্ত বিঘ্নে বিজড়িত—সে জন্যে ক্ষোভ করে কি হবে?"

পরের একখানা চিঠি নাসিক থেকে লেখা—লিখছেন[২] —"পুরাণো বই বিক্রি করে কাজ নেই—আমি অন্য কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করব।" মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কিছু বই প্রিয়নাথের নিকট ছিল। অর্থাভাবে কবি বইগুলি বিক্রি করে টাকা পাঠাবার জন্যে বন্ধুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পুরাণো বই বিক্রি করা অসুবিধাজনক বন্ধু প্রিয়নাথ বোধহয় এই কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—এবং তারই উত্তরে কবির এই চিঠি।

গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথের যে সব জিনিষ ছিল সেগুলো বিক্রি করার ব্যবস্থা হয়েছে। বন্ধুকে লিখছেন,[৩] "এখন যদি টাকা দেবার সুবিধা না হয়ত থাক্। গাজিপুর থেকে আমার জিনিষ বিক্রির দরুণ কিছু টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে। সেটা পেতে যদি বিলম্ব হয় তা হলে আর একবার তাগাদা করব। নইলে একটা দিনের (মত ?) তোমরা একরকম নিশ্চিন্ত থাকতে পার।" সোলাপুর থেকে ১৮৮৯ সালে লিখছেন,[৪] "কাজের কথাটা পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে না বলে গোড়াতেই বলা ভাল, তারপরে অন্য কথা হবে। বাকি টাকাটার জন্যে সত্য আমাকে বার বার চিঠি লিখচে, অত্যন্ত আবশ্যক হয়েছে—আর বিলম্ব না করে সেটা দিয়ে ফেল। তুমি ত

---

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৪৩, পত্রসংখ্যা ৫৬

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৪৫, পত্রসংখ্যা ৬১

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৪৮, পত্রসংখ্যা ৬৪

৪ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৫০, পত্রসংখ্যা ৬৬

আমার বর্তমান অবস্থা জান। খবর পেলুম আষাঢ় মাসের পূর্বে আমাদের মাসহারার টাকা বেরোবে না। অতএব তোমার উপরে একান্ত নির্ভর করে রইলুম—সত্যকে শীঘ্র টাকাটা পাঠিয়ে দেবে।” সত্য অর্থাৎ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়—ভাগ্নে। বোধহয় তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন, তার কিছু শোধ করেছিলেন, কিছু বাকী ছিল। একথা প্রিয়নাথ জানতেন বলে মনে হয়। সত্যপ্রসাদের টাকার প্রয়োজন হওয়ায় তাগিদ দিয়েছেন কবিকে, কবি আবার তাগিদ দিচ্ছেন বন্ধুকে প্রাপ্য টাকা শোধ করে দিতে।

এ পর্যন্ত আলোচিত চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথের অর্থাভাবের কথা যা প্রকাশ পেয়েছে তার কারণ নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে মনে হয়, তিনি সে সময় যে সব বই লিখতেন, সেগুলো হয়তো নিজের খরচে ছাপাতে হ'ত এবং বিক্রীও বেশী হ'ত না। ফলে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ খুব বই পড়তেন। Thacker Spink এর বাড়ী বই কিনতে যাওয়ার কথা অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে। ব্যয়াধিক্যের এটাও একটা কারণ হতে পারে।

১৮৮৯ এর পর ১৮৯৯ এর জুন মাসে লেখা একখানা চিঠিতে টাকার কথা লিখছেন। এর মধ্যে আর কোনো চিঠি সংগৃহীত চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। দশবছর যে পত্রালাপ হয়নি এমন হতে পারে না। মনে হয়, সে সব চিঠি পাওয়া যায়নি। উক্ত চিঠিতে লিখছেন,[১] “তিন হাজার বাদে সেই টাকাটা কবে পাওয়া যাইবে বলিতে পার? সেই টাকাটার অপেক্ষায় কোন প্রকার সংশোধনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না।” এখানে কোন্

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৫৫, পত্রসংখ্যা ৭১

টাকার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা অনুমান করা সম্ভবপর নয়। তবে এখন থেকে তাঁকে যে সব ঋণ করতে দেখা যায় তার প্রধান কারণ হোলো কুষ্টিয়ার ব্যবসায়। ১৮৯৫ সালে (১৩০২) সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং ধীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ায় 'ঠাকুর কোম্পানি' নামে এক কারবার খোলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়িত করেন নি। কিন্তু বেশীদিন দূরে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। কারণ দেখা গেল, "সুরেন্দ্রনাথের মন ক্রমশঃ জীবনবীমা সমবায় প্রভৃতি জাতীয়-জীবনের বৃহত্তর কর্মাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।" সুতরাং সমস্ত ভার পড়ল বলেন্দ্রনাথের উপর। কিন্তু তিনি ছিলেন, "সাহিত্যিক, আদর্শবাদী, মনুষ্যচরিত্রে অনভিজ্ঞ।" সুতরাং 'অতিবিশ্বাসী ম্যানেজার' ৭০—৮০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে উধাও হোলো। বিপদের এখানেই শেষ হোলো না। বলেন্দ্রনাথ যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এবং দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর ১৮৯৯ (১৩০৬) সালে মারা গেলেন। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ব্যবসায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চরম বিব্রত হয়ে পড়লেন। বিপর্যস্তও বলা যেতে পারে। ব্যবসায়কে টিকিয়ে রাখার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টা! বন্ধু প্রিয়নাথকে তো বার বার টাকার জন্যে লিখছেনই—তাছাড়া চাঁচলের রাজা, আমলাসারে গুড়ের ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারী প্রভৃতিরও কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের কথা চলছে। বই এর কপি রাইট বিক্রী ও বাড়ী বন্ধকের কথাও চিন্তা করছেন।[১] ১৮৯৯ সালে, ১৮ই জুন, বন্ধু প্রিয়নাথকে লিখছেন শিলাইদহ থেকে—"আজ সুরেন লিখিয়াছেন—ঘোষকররা ২০,০০০৲ টাকা সাত পার্সেন্ট সুদে আমার

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৫৭, পত্রসংখ্যা ৭২

বাড়ি রাখিয়া ধার দিতে প্রস্তুত—৬ মাসের কড়ারে দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি, ইতিমধ্যে এ টাকাটা লইয়া, পরে তোমার প্রস্তাবিত সেই টাকায় তাহা উদ্ধার করিয়া লওয়া কি শ্রেয় বিবেচনা কর ?……" এখানে কোন্ বাড়ি বন্ধক রাখার কথা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। মনে হয় কবির নিজের তৈরী জোড়াসাঁকোর লালবাড়ি। এ চিঠির দিন দুই পারে লিখছেন,[১] "আমরা যে পক্ষ হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছি তাঁহাদের সেই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার আর বিলম্ব কত ?" এখানে মনে হয় যাঁরা টাকা দেবেন বলেছিলেন তাঁদের বাড়ীতে কোনো বিবাহ ব্যাপার ছিল। বিবাহ শেষ হয়ে গেলে টাকা দেবেন হয় তো এই রকম কথা হয়েছিল। কবি তাই জানতে চাইছেন বিবাহের বিলম্ব কত। এ টাকা পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কয়েক দিন পরে লিখছেন[২] "……অপেক্ষায় না থেকে আর এক পক্ষের নিকট হতে তুমি ৭৷৷০ পার্সেণ্টে টাকা তোলার যে প্রস্তাব করেছ সেটা আমার কাছে হৃদয়গ্রাহী ঠেকচে—কারণ, যো ধ্রুবানি পরিত্যাজ্য" ইত্যাদি শাস্ত্রে আছে এবং যবনেরাও বলে "দুটো পাখী ঝোপে থাকার চেয়ে একটা পাখী হাতে থাকা ভাল—বিশেষতঃ আমরা আমাদের কুষ্টিয়ার সমস্ত জঞ্জাল যথাসম্ভব সত্বর চুকিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব হতে চাই।" টাকা পেতে দেরি হচ্ছে, তাই আবার লিখছেন,[৩] "আজ পর্যন্ত কোন খবরাদি না পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি।……র টাকাটা যদি পাওয়া যায় কোন্ সময়ের

---

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৬০, পত্রসংখ্যা ৭৩

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৬৭, পত্রসংখ্যা ৭৭

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৬৮, পত্রসংখ্যা ৭৮

মধ্যে পাব তার কি একটা ঠিক খবর জানা যাবে?" ইতিমধ্যে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হোলো। কবি কোলকাতা থেকে প্রিয়নাথকে লিখছেন,[১] "তুমি যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা করিবে তাহাই করিবে। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। যদি টাকাটা আরও কিছু বাড়াইয়া লইতে পার চেষ্টা করিয়ো।" এর পরের চিঠিতে কোনো তারিখ নেই। তবে সেপ্টেম্বর মাসের কোনো তারিখে লেখা বলেই মনে হয়। লিখছেন,[২] "সেই ৪০,০০০ টাকার ঋণপত্রের যে কপি পাইয়াছি তাহার মধ্যে যে নিয়মে টাকাটা শোধ করিবার প্রস্তাব ছিল তাহার কোনও উল্লেখ না দেখিয়া কিছু ভীত হইয়াছি। মূল দলিলে কি এরূপ লেখা ছিল না?" এর পরের চিঠি লেখা ১৭ই নভেম্বর, ১৮৯৯। ঐ ৪০,০০০ টাকা যাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন মনে হয় তাদেরই অ্যাটর্নি দলিল রেজেষ্ট্রী করাবার জন্যে তাগিদপত্র দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে লিখছেন,[৩] "আজ হঠাৎ অ্যাটর্নি···ঘোষের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেছি—নিম্নে কপি করে পাঠাই:— The document in favour of my client Babu···requires registration : as three months have expired, the document must at once be registered or a fresh one executed so that you will have 4 months within which the 2nd document may be registered. An early reply will oblige.) গভীর উৎকণ্ঠায় ঐ চিঠিতেই কবি লিখছেন—"এর

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৭১, পত্রসংখ্যা ৮২

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৭২, পত্রসংখ্যা ৮৪

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৮১, পত্রসংখ্যা ৯৩

অর্থ কি ? কি জবাব দেওয়া যাবে ? এরা যে রকম Party দেখচি তাতে আমাকে হঠাৎ বিপদে ফেলবার চেষ্টা করা অসম্ভব নয়। এক বৎসরের কড়ার আছে। তার পরে বেঁকে দাঁড়ালে একদম মুস্কিলে পড়ব। কি উপায়ে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার হওয়া যায় আমাকে শীঘ্র লিখেপাঠিয়ো। মনটা নিতান্ত উদ্বিগ্ন আছে।" কি দারুণ অর্থকৃচ্ছ্র তার মধ্য দিয়ে কবিকে তখন চলতে হচ্ছিল এ চিঠি থেকে সেটা বেশ অনুমান করা যায়। দিন দুই পরে অর্থাৎ ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯ সম্ভবতঃ উক্ত দেনা সম্পর্কে লিখছেন[১]—"তোমার চিঠিমত……কে লিখে দিলুম। যদি রেজেষ্ট্রী করতেই হয় তাহলে আর কারো কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই লোকটাকে শোধ করে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এরকম লোকের হাতে বন্ধ হয়ে থাকা ভয়ঙ্কর।……কি আয়ত্তাতীত ? যদি রেজেষ্ট্রী করাও যায়—এবং আমার সঙ্গে সুরেনেরও নাম জড়িয়ে কোন সুবিধে থাকে তাতেও প্রস্তুত আছি কিন্তু নিরাপদ হওয়া চাই—এবং সুদ যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে কমানো যায়। কিন্তু খরচাতেই বধ করে। আমি হিসাব করে দেখেছি যে টাকাটা এক বৎসরের কড়ারে আমরা নিয়েছি তার খরচা ধরতে গেলে ১৪ পার্সেণ্ট পড়ে। যাই হোক্ তুমি যেটা সুপরামর্শ বোধ কর তাই কোরো।" এসব ঋণ-গুলো যে কুষ্টিয়ার ব্যবসায় সংক্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। ৮ই আগস্ট, ১৯০০, প্রিয়নাথকে একখানা চিঠি লিখছেন। এ চিঠিখানা থেকে যেন মনে হয় ঐ ৪০,০০০ টাকা কোনো মাড়োয়ারীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। লিখছেন,[২] "……২০,০০০ যদি ৮ পার্সেণ্টে এবং অন্ততঃ বছর

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ৮২, পত্রসংখ্যা ৯৪

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১১২, পত্রসংখ্যা ১১৮

তিনেকের মেয়াদে এবং অত্যধিক খরচা ব্যতিরেকে পাওয়া যায় তাহলে মাড়োয়ারীকে শুধে দিয়ে ভার লাঘব করা যায়। কি বল? যদি সুবিধা থাকে ত কিংকর্তব্য লিখো।"

এর পরের চিঠি সম্ভবতঃ উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কেই লেখা। লিখছেন,[১] "আজ সুরেনের চিঠি পেলুম। শুনলুম সে তোমার সঙ্গে দেখা করেছে। সে লিখেছে, ৯ পার্সেণ্টে সহজে বন্দোবস্ত হতে পারে তুমি তাকে বলেচ---এই জন্যে আমার প্রতি তার পরামর্শ এই যে ৯ পার্সেণ্টেই প্রস্তাব খতম করে ফেলা। কেবল খরচাটা যাতে দুঃসহ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। কি বল? তাই না হয় ঠিক করে ফেল! সেজন্যে কি আমার কলকাতায় যাওয়া দরকার হবে—সুরেনের প্রতি আমার Power of Attorney দেওয়া আছে—সকলপ্রকার ক্ষমতাই দিয়েছি—যদি সেটাতেকাজ চলে তাহলে আর নড়তে চাইনে।" আগস্টের শেষ কিংবা সেপ্টেম্বরের কোনো এক তারিখে একখানা চিঠিতে লিখছেন,[২] "আমি তোমাকে সত্যি বল্‌চি এখন আমাদের কারো হাতে একপয়সা নেই। আমার একমাত্র মহাজন হচ্ছেন সত্য—তাঁর কাছ থেকে ইতিমধ্যে ২০০৲ টাকা ধার নিয়ে সংসার চালিয়েচি·····। আমাদের পরিবারে আজকাল এমন দুর্ভিক্ষ বিরাজ করচে যে সে দূর থেকে তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না। আমি নিজের জন্যে কাল দুপুরবেলা কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলুম কিছু সুবিধা করতে পারলুম না। দেনা যে ক্রমে কত বেড়ে যাচ্ছে সে বলতে পারিনে। এদিকে আমাদের মাসহারা বহুকাল থেকে আর্দ্ধেক বন্ধ হয়ে আছে, কি করে যে শুধ্‌রে

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৩০, পত্রসংখ্যা ১২৪

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৩৩, পত্রসংখ্যা ১২৬

ভেবে পাইনি। আমার বয়সে আমি কখনো এমন ঋণগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত হইনি।" চিঠিখানার অর্থ অনুমান করা সহজ নয়। প্রিয়-নাথ কি রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামর্থ্য এই ভাবে জানাচ্ছেন? এর পর কয়েকমাস কোনো চিঠিতে টাকার উল্লেখ দেখা যায় না। ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০১, লিখছেন,[১] "বাঁচা গেল! আমার টাকার দরকার বারো হাজার! কিন্তু শুন্‌চি মহাজন ৬,০০০ হাজারেই ক্ষান্ত থাকবে—সেটা জনশ্রুতি মাত্র। যদি ১২,০০০ বা ১০,০০০ পার যোগাড় কোরো, নইলে ৬,০০০ই সই।" এর পরের চিঠি ১৩ (?) মার্চ, লেখা। এই একমাসের মধ্যে কি আর কোনো চিঠির আদান প্রদান হয়নি? লিখছেন,[২] "ভাবিয়াছিলাম বৈষয়িক চিঠি লিখিব না। কানে ধরিয়া লেখাইল। আজ…র…বাবুরা তাঁহাদের টাকাটা তুলিয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। ১২,০০০ টাকা, দশ টাকা হারে সুদ। ওদিকে সুরেন এখন বায়ুপরিবর্ত্তনে কটকে গেছে—মহাজন টাকাটা ৯।১০ দিনের মধ্যে চায়। অবস্থা এইরূপ! কি পরামর্শ দাও? আপাততঃ আপনা-আপনি কারো কাছ হইতে (যথা চন্দ্রব্রাদার্স) যোগাড় করিয়া দিতে পার?……" এর পরদিনই অর্থাৎ ১৪ই মার্চ লিখছেন,[৩] "……।…র…বাবুরা বোধহয় পূরা টাকা না পেলেও ৫।৬ হাজার পেলেই আপাততঃ ঠাণ্ডা থাকবেন…। তা যদি হয় তবে অন্ততঃ ঐরকম পরিমাণ-টাকাটা সংগ্রহ করে দিলে একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পাই। দোহাই তোমার সুদটা যাতে ১০পার্সেন্টের বেশি না হয়

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৫১, পত্রসংখ্যা ১৩৪

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৫৯, পত্রসংখ্যা ১৩৭

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৬১, পত্রসংখ্যা ১৩৮

সেই চেষ্টা কোরো। নইলে বহু দুঃখজালে জড়িত হতে হবে। নিতান্তই অসম্ভব হলে ১২ পার্সেন্টই শিরোধার্য করে নিতে হবে —কিন্তু এ টাকাটা একটু চেষ্টা করে তোমাকে সংগ্রহ করতেই হবে —কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।" কবির প্রস্তাব মতো প্রিয়নাথ যে টাকাটা সংগ্রহ করে দিতে পেরেছিলেন পরের চিঠিতেই তার প্রকাশ—[১] "নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন কিছুদিন সুনিদ্রার প্রত্যাশা করি। টাকাটা তুমি যদু চাটুয্যের হাতে দিলে সে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে।" বোধহয় হ্যাণ্ডনোট দিয়ে কারও কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কি করে হ্যাণ্ডনোট লিখতে হয় বন্ধু প্রিয়নাথের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চিঠিতে সেরকম কিছু না থাকায় লিখছেন,[২] "ভেবেছিলুম আজ তোমার কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট রচনার একটা নমুনা পাওয়া যাবে। কই?" এর প্রায় এগার মাস পরে ৩রা এপ্রিল, ১৯০২, তারিখে লেখা একখানা চিঠিতে মহাজনের তাগিদপত্রের ১খানা কপি পাঠাচ্ছেন, লিখছেন[৩] "......র পত্রের কপি পাঠাই:—

I beg to remind you that you agreed to pay up my money within a year but the year is past and I am sorry to say, you have done nothing towards liquidation so I request you to pay off within the 15th of the current month." টাকাটা শোধ করিয়া দেওয়া বোধহয় কঠিন হইবে না। কিন্তু এরূপ স্বল্প মেয়াদ দেওয়াতে

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৬২, পত্রসংখ্যা ১৩৯

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৯০, পত্রসংখ্যা ১৫৯

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৯৪, পত্রসংখ্যা ১৬৩

আমাদিগকে হঠাৎ বিপদে ফেলিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়। এই জন্যই পাঁচ বৎসরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করিবার কথা ছিল। "যাহা হউক্ এই আকস্মিক বিপৎপাত হইতে বোধহয় উদ্ধার হইতে পারিব। সুরেনকে……র পত্র পাঠাইয়া চিঠি লিখিয়া দিলাম।" কে এই মহাজন, ঋণের পরিমাণই বা কত কিছুরই প্রকাশ নেই।

এই চিঠির ঠিক দু দিন পরে অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল তারিখে লিখছেন,[১] "তুমি যদি অন্যত্র হইতে সহজে ৪০ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পার তাহা হইলে মুক্তি পাই। আজ সুরেনের পত্রে আর এক জায়গা হইতে টাকা পাইবার আশ্বাস পাইয়াছি—কিন্তু যিনি দিতে রাজি হইয়াছেন তাঁহার হাতে পূরা টাকা না থাকাতে তাঁহাকে কাগজ ভাঙান প্রভৃতির হাঙ্গামে যাইতে হইবে—এবং তাহা হইলে অনেক টাকা লোকসান দিতে হইবে বলিয়া যদি অন্যত্র সহজে পাওয়া যায় ত ভাল হয় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমি সুরেনকে তোমার সহিত দেখা করিতে বলিব।" এক জায়গা থেকে ৪০-৫০ হাজার টাকা ধার নেওয়ার উদ্দেশ্য বোধহয় এখানে-ওখানে যে সব দেনা ছিল সেগুলো মিটিয়ে ফেলে দেনাটা একটা জায়গাতেই রাখার ইচ্ছা। উত্তরে প্রিয়নাথ কি লিখেছিলেন জানা যায় না তবে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,[২] "তুমি যে নিয়মে যে যে প্রস্তাব করেচ তাত আমার কাছে বেশ ভালই লাগল—এতে কোন আপত্তিই হতে পারে না। উকিল খরচাটা সম্বন্ধে একটু টানাটানি কোরো। অন্যত্র যেখান থেকে আমাদের টাকা পাবার কথা হচ্চে সেখানে কোম্পানি কাগজ ভাঙাবার discount এ প্রায় হাজার

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৯৫, পত্রসংখ্যা ১৬৪

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৯৮, পত্রসংখ্যা ১৬৭

টাকা দিতে হচ্চে আর কিছু লাগবে না। তুমি সুরেনের সঙ্গে কথা কোয়ো কিম্বা চিঠি লিখো।" প্রায় মাসখানেক পরে লিখছেন,[১] "সেই……চাঁদের টাকার বন্দোবস্ত করতে আমাকে ক্রমাগতই জোড়াসাঁকো থেকে বালিগঞ্জ আনা গোনা করতে হয়েছে। "…… যাইহোক্ সেই টাকাটার একটা গতি করতে পেরে আপাততঃ একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। দেখা যাক্ সঙ্কট আবার কখন্ আর কোন্ মূর্তিতে দেখা দেয়।" কে এই "……চাঁদ"? কোনো মাড়োয়ারী মহাজন কি?

মে, ১৯০২ এর পর ১৯০৩ এ লেখা একখানা চিঠি—কোনো তারিখ নেই—মনে হয় ব্যবসায় সংক্রান্ত ঋণ সম্পর্কে এইখানাই শেষ চিঠি। লিখছেন,[২] "আমরা যেখান থেকে টাকা ধার নিয়েছি সেখানে আমাদের কোন আশঙ্কা বা তাগিদ নেই। নূতন জায়গায় নূতন বন্দোবস্ত করবার খরচপত্র আপাতত অনাবশ্যক।" অনুমান, এই টাকা নিয়েছিলেন তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে। তারকনাথ কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু। তারকনাথের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী'তে ৪১ পৃষ্ঠার ১৯০০ সালের রবীন্দ্রজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে লিখছেন,—"কুষ্টিয়ার ব্যবসায় লইয়া অত্যন্ত বিব্রত, ঋণদায় বাড়িতেছে। অবশেষে তারকনাথ পালিতের নিকট হইতে টাকা করিয়া সর্বঋণ মুক্ত হল। মিঃ পালিতের ঋণ শোধ হয় ১৯১৭ সনে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়া প্রাপ্ত অর্থ হইতে।" এখানে ১৯০০

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ২০১, পত্রসংখ্যা ১৬৯

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ২০২, পত্রসংখ্যা ১৭০

সালের ঘটনার মধ্যে তারকনাথের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের কথার উল্লেখ থাকলেও ঐ বৎসরই যে রবীন্দ্রনাথ ঋণ গ্রহণ করে 'সর্বঋণ মুক্ত' হল এটা ঠিক নয়। কারণ আরও ৩ বৎসর অর্থাৎ ১৯০৩ সাল পর্যন্ত। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে ঋণ সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্যে খান নয়েক চিঠি লিখতে দেখা যাচ্ছে এবং ১৯০২ সালের ৬ (?)ই এপ্রিলের চিঠিতে 'চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ হাজার' টাকার কথাও লিখেছেন। পূর্বেই অর্থাৎ ১৯০০ সালেই যদি তিনি 'ঋণমুক্ত' হয়ে থাকেন তাহলে এসব চিঠিতে আবার ঋণের কথা লিখছেন কেন? তবে প্রভাত কুমার 'অবশেষে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ 'শেষ পর্যন্ত' ধরলে ১৯০৩ সাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ১৪ বৎসর তারক নাথের ঋণের বোঝা কবি বহন করেছিলেন এবং যার সুদের পরিমাণ ছিল বছরে ৮ পার্সেণ্ট। লস এঞ্জেলিস থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন—[১] "খরচ বাদে ত্রিশ হাজার টাকা আমার হাতে জমলেই আমি তোকে পাঠিয়ে দেব। তারকবাবুর যে টাকাটা ধারি। এখন যে দেনাটা কলকাতা য়ুনিভার্সিটির হাতে গিয়ে পৌঁচেছে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তার মেয়াদ ফুরোবে—অতএব আগামী বৎসরেই এই টাকাটা শোধ করে দিয়ে মাসিক সুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিস্।"

চিঠিপত্র ৮এর সংযোজনের ৮নং চিঠিতে কোনো তারিখ নেই। তবে মনে হয় ১৮৮৮ থেকে ১৯০০র মধ্যে লেখা। এই চিঠিতে লিখছেন—"আমাকে বোধ হচ্ছে কালই যেতে হবে। ইতিমধ্যে তুমি একবার হাটখোলার……দের সেই সম্বন্ধে কোনরকমে approach করতে পার? তারা বোধহয় অনেকটা বিশ্বস্ত চিত্তে এবং গোপনে একাজ সম্পন্ন করতে পারে।"

১ চিঠিপত্র ২, পত্র ১৯, ১১ অক্টোবর, ১৯১৬

কুষ্টিয়ার ব্যবসায় এত কাণ্ড করেও বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। কুষ্টিয়ার কারখানা বন্ধক রাখবার কথা চলছে। প্রস্তাবটা বোধহয় প্রিয়নাথের কাছ থেকেই এসেছে। তাই লিখছেন,[১] "তোমার প্রস্তাব সুরেনের কাছে লিখে পাঠালুম। বোধহয় কুষ্টিয়ার কারখানা বন্ধক রাখবার আর কোনও আপত্তি নেই কেবল পাছে বাজারে discredit হয় এই ভয়। যদি জানাজানি না হয়ে গোপনে কাজটা হয়ে যায় তাহলে কোন আশঙ্কা বা আপত্তি নেই।" এই চিঠিতে আবার ধারের কথাও আছে। লিখছেন, "সুরেনকে একখানা চিটি লিখে ধার নেওয়া ব্যাপার সম্বন্ধে একটা interview ঘটিয়ো। আজকাল তার উপরেই ভার নিক্ষেপ করে আমি যথাসাধ্য অবসর পাবার চেষ্টা করছি। কৃতকার্য হতে পারছিনে তবু চেষ্টা ছাড়ছিনে। সে যেরকম বলে তাতেই আমার মত জানবে।" এ প্রস্তাবের ফল কি হয়েছিল সেটা অজ্ঞাত। তবে দেখা যাচ্ছে—"......তাই কুষ্টিয়ার ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া কারবারের জিনিসপত্র কোম্পানির যজ্ঞেশ্বর নামে এক কর্মচারীকে সামান্য খাজনায় দান করিয়া দিলেন; কালে এই যজ্ঞেশ্বর কুষ্টিয়ার অন্যতম ধনী মহাজনরূপে খ্যাতিমান হন।"

এ পর্যন্ত যে-সব ঋণের কথা উল্লেখ করা গেল তার কারণ দুটো। প্রথমটা কবির নিজের ভাষা উদ্ধৃত করেই বলি—"অল্প বয়সে নিজের প্রয়োজন ছাড়া আর প্রয়োজনই ছিল না—এইজন্যে বই কিনেছি আর টাকা ছড়িয়েছি। তার ফলে কিছু হাতে থাকত না......।" এটুকু বন্ধু প্রিয়নাথকে লেখা অভিমানেভরা একখানা চিঠির অংশ বিশেষ। দ্বিতীয় কারণ কুষ্টিয়ার ব্যবসায়। এ ছাড়াও আরও

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ২০৩, পত্রসংখ্যা ১৭১

ছুটো কারণে তাঁকে ঋণ করতে হয়েছিল। একটা কারণ জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ, অপরটা নিজের জন্যে বাড়ি তৈরি। এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক্।

জোড়াসাঁকোর আদিবাড়ি ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ বাড়িরই সামনে পূর্বদিকে নিজের জন্যে একখানা বাড়ি তৈরি করান যাকে লালবাড়ি বলা হয়। এই বাড়ি তৈরি করাতে তাঁকে বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা ধার করতে হয়। এ ছাড়াও ঐ বাবদে আরও কিছু খুচরো দেনা ছিল। ১৯০০ সালের আগস্ট মাসে প্রিয়নাথকে লিখছেন,[১] "একটা কাজের ভার দেব? আমার বাড়ি তৈরি বাবদ লোকেনের কাছে আমি ৫,০০০ টাকা ঋণী—ঐ সম্বন্ধে খুচরো ঋণ আরো কিছু আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্যন্ত সমস্ত কাব্যের কপিরাইট কোন ব্যক্তিকে ৬,০০০ টাকায় কেনাতে পার?............লোকেন ঋণ শোধের জন্যে আমাকে কখনো তাড়া দেবে না আমি সেই জন্যেই নিজের তাড়ায় তার ঋণ শোধের জন্যে মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। সে অত্যন্ত অসময়ে আমাকে এই টাকাটা দিয়ে নানা বিপত্তি হতে রক্ষা করেচে—তারপর এই টাকাটা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই করে না।............" তৃতীয় চিঠিতে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,[২] "আমার কপিরাইট বিক্রি করার কথাটা চিন্তা কোরো এবং পার ত চেষ্টাও কোরো।" এই সময় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনই প্রিয়নাথকে বিভিন্ন বিষয়ে চিঠি লিখছেন। ৮ই আগস্টের চিঠিতে

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১০১, পত্রসংখ্যা ১০৩

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১০৮, পত্রসংখ্যা ১১৬

লিখছেন,[১] "লোকেনের দেনা শুধ্‌তে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেইজন্যে আমি কপিরাইট বেচতে প্রস্তুত হয়েছি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই—বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। কোন ছাপাখানাওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তাহলে ঠকে না এটা নিশ্চয়।" ১২৪নং পত্রের শেষ পংক্তিতে প্রশ্ন—"কপিরাইট?" সম্ভবতঃ কপিরাইট বিক্রি করা সম্ভব হয় নি। কয়েক মাস পরে প্রিয়নাথকে লিখছেন,[২] "বল কি? ক্রমাগত পিছিয়ে পিছিয়ে এতদিন পরে যদি লোকেনকে টাকা না দিই তাহলে আমি ইহজন্মে আর মাথা তুল্‌তে পারব না। আমার হৃদয় এ কথায় কোনমতেই সায় দিতে চাচ্ছে না। সে তার এখানকার সমস্ত বাজার দেনা প্রভৃতি শোধ করে যাবার জন্যেই এ টাকাটা শীঘ্র চেয়েছে............।" লোকেন্দ্রনাথের এই দেনা কবে কিভাবে শোধ করেছিলেন জানা যায় না।

কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা (মাধুরীলতা)-র বিবাহ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে হয়। বিবাহের সম্বন্ধ করেন প্রিয়নাথ সেন। কিন্তু মুস্কিল হয় পাত্রপক্ষের দাবী নিয়ে। তাঁদের দাবী দশ হাজার টাকা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত টাকা দেওয়া তখন সম্ভব ছিল না। তাই বন্ধুকে লিখছেন,[৩] "বেলার যৌতুক সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত, মোটের উপর ১০,০০০পর্যন্ত

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১১২, পত্রসংখ্যা ১১৮

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৮৬, পত্রসংখ্যা ১৫৫

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৬৬, পত্রসংখ্যা ১৪২

আমি চেষ্টা করতে পারি। সেও সম্ভবতঃ কতক নগদ এবং কতক ইন্‌স্টলমেণ্ট-এ। অবশ্য ইন্‌স্টলমেণ্ট-এর ব্যবস্থা আমার পক্ষে হিতকর নয়—কিন্তু নিতান্তই যদি অনটন হয় তবে উপায় নেই। সম্ভবতঃ এখন ক্যাশ-এ অতি অল্প টাকাই আছে—বাবামশায় কখনো ঋণের প্রস্তাবে সম্মত হবেন না—অতএব এতকাল পরে এই দুঃসময়ে কোনমতে আমি বড় যৌতুকের কথা তুল্‌তে পারিনে। সাধারণতঃ বাবামশায় বিবাহের পরদিন ৪।৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে আশীর্বাদ করে থাকেন—সেজন্যে কাউকে কিছু বলতে হয় না। বিশ হাজার টাকার প্রস্তাব আমি তাঁর কাছে উত্থাপন করতেই পারব না।" প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে লিখছেন,[১] "পাত্রপক্ষের দাবী প্রায় দশ হাজার টাকার ; কিন্তু অত টাকা দিবার সাধ্য রবীন্দ্রনাথের নাই।" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখছেন যে পিতার কাছে "বিশ হাজার টাকার" প্রস্তাব তিনি করতেই পারবেন না। অতএব যৌতুকের টাকার পরিমাণ দশ হাজার অথবা বিশ হাজার তা বুঝা গেল না। এমনও হতে পারে যে শুধু যৌতুকেই দশ হাজার এবং বিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ বাবদও দশ হাজার এই মোট বিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় চিঠিতে লিখছেন,[২] "যৌতুক সম্বন্ধে তোমাকে খোলসা লিখিয়াছি। যাহা অসাধ্য জানি তাহার জন্য চেষ্টা করা অনর্থক। বাবামশায়কে বিরক্ত ও পরিবার সুদ্ধ সকলকে অসন্তুষ্ট করিয়া আমি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নই। এ সময়ে তাঁহাকে উৎপীড়ন করা আমি কিছুতেই পারিব না। বারম্বার পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে কৃতকার্য হইতে পারি কিন্তু তাহা

১ রবীন্দ্রজীবনী ১ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫৪

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৬৮, পত্রসংখ্যা ১২৩

আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব—এবং আমার পিতার কোন পুত্রই বিশেষ প্রয়োজনের স্থলেও এমনতর করিয়া নির্বন্ধ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।" এর পরের চিঠি থেকে মনে হয় ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের মাধ্যমে মহর্ষিদেবের কাছে যৌতুকের টাকার কথাটা উত্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। সত্যপ্রসাদ তার উত্তরে যা লিখেছেন কবি বন্ধুকে সেটা জানাচ্ছেন,[১] "এইমাত্র সত্যের কাছ থেকে পত্র পেলুম। সে লিখছে এখন বাবামশায়ের কাছে দরবার করার অনেক বিঘ্ন—বৈশাখের আরম্ভে বিঘ্ন দূর হলে কথাটা উত্থাপন করা তার মত—আমিও তাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করলুম। অতএব আপাততঃ ন যযৌ ন তস্থৌ থাকা যাক্"। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার লেখা চিঠিপত্রের সবগুলোতে কোনো তারিখ নেই। সুতরাং পারম্পর্য ঠিক করা কঠিন। পাত্রপক্ষের দাবীদাওয়া নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একখানা চিঠিতে প্রিয়নাথকে লিখছেন,[২] "...আমার একটা কেবল আশঙ্কা হচ্ছে যে, যে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে সেটা হয়ত সম্পূর্ণ শরতের ভোগে আসবে না। যা হোক্ সে নিয়ে অক্ষেপ করা বৃথা। তোমার পত্রের উত্তর পেলে গহনা এবং অন্য সকল ব্যাপারের ব্যবস্থা করতে হবে—তার জন্যে সময়ের আবশ্যক।" দেখা যায় শেষ পর্যন্ত যৌতুক দশহাজার টাকাতেই রফা হয়েছিল। এর পরের চিঠি,[৩] "...বাবামশায়ও বিবাহের পূর্বে যৌতুক দিবেন না স্থির-প্রতিজ্ঞ—অতএব তুমি এই সঙ্কটের যদি কোন সুপথ থাকে

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৭৮, পত্রসংখ্যা ১৪৯

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ২২৪, পত্রসংখ্যা ১৩ (সংযোজন)

৩ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ২২৫, পত্রসংখ্যা ১৪ (সংযোজন)

অবলম্বন করিয়ো—আমাদের পক্ষ হইতে আমি তো কোনো সুযোগ ভাবিয়া পাইনা।...বাবামশায় যৌতুক বিবাহের পূর্বে দিতে কোন-মতেই রাজি হইবেন না ইহা স্থির নিশ্চয়—সত্যও আমাকে তাই লিখিয়াছেন।" এ সম্পর্কে শেষ চিঠিতে দেখা যায় বিবাহের পূর্বেই যৌতুক দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ এটা পিতার আগোচরেই করছেন। লিখছেন,[১] "সুরেনকে লিখে দিয়েছি সেই যৌতুকের টাকাটা কিভাবে কখন্ কার হাতে দিলে সর্বতোভাবে নিরাপদ হবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে ও স্থির করে আমাকে জানাতে—তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি?" বেলার বিবাহ হয় ১লা আষাঢ়, ১৩০৮ সাল।

উপরে বর্ণিত ঋণগুলো ছাড়াও আরও দু একটা ঋণের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলো কি উপলক্ষে ঠিক বুঝবার উপায় নেই। একখানা চিঠিতে লিখছেন,[২] "অল্পদিনের মধ্যে শোধ দিতে হবে শুনে এবং ডিস্কাউন্টের আশঙ্কায় আমি অন্য স্থানে চেষ্টা করে ৯ পার্সেণ্টে কৃতকার্য হয়েছি। যদি দীর্ঘকালের মেয়াদে হাজার দশেক যোগাড় করে দিতে পার তাহলে সুবিধা হয়—কিন্তু খরচায় এত বেশি পড়ে যায় যে ভেবে দেখতে গেলে তাতে আমাদের বিশেষ সাহায্য হয় না—বরঞ্চ একটু ক্ষতিই হয়। সেইজন্য ইতঃস্তত করতে হয় যাই হোক্, আসন্ন সঙ্কটটা হয়ত কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব। যদি নিতান্ত ঠেকে, তাহলে হাজার পাঁচ ছয় সংগ্রহ করতে কি তোমার ক্লেশ হবে?" এই 'আসন্ন সঙ্কটট' কি? এর পূর্বের চিঠিতেই অবশ্য বেলার বিয়ের যৌতুকের কথা আছে। এই চিঠি ১৯০১এর মার্চে লেখা। এপ্রিল

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৮৯, পত্রসংখ্যা ১৫৮

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৭০, পত্রসংখ্যা ১৪৪

মাসে আবার লিখছেন,[১] "মনে করেছিলুম সেই ছ'হাজার টাকার জন্যে তোমাকে আর বিরক্ত করতে হবে না—কিন্তু আবার দরকার হয়েছে। তুমি চন্দ্র ব্রাদার্সের কাছ থেকে টাকাটার বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে? আমি সোমবারে সকালের গাড়িতে শিলাইদহে রওনা হতে চাই তুমি রবিবারের মধ্যেই টাকাটা দিলে আমার সুবিধা হয়।" কোন্ 'ছহাজার টাকা?' পরের চিঠিতে এই ছ'হাজার টাকা শোধ করবার কথা লিখছেন,[২] "সেই ৬,০০০ টাকা শুধিয়া ফেলিতে চাই—যদি হ্যাণ্ড্‌নোট সুদ্ধ একজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইতে পার তবে সুবিধা হয় অথবা আর কি কর্তব্য লিখিবে।"

দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখছেন যে রবীন্দ্রনাথ পাটের ব্যবসার জন্যে তাঁর এক ধনী প্রজার কাছ থেকে একলক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। এর কোনো রকম লেখাপড়া কিছু ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ টাকা শোধ করতে পারছেন না—এদিকে তামাদি হওয়ার সময় আগতপ্রায়। প্রজামহাজন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে একথা স্মরণ করিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেন, "ভদ্রলোক যে টাকা ধার করেন—তা কি কখনো তামাদি হতে পারে? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো বেনী"। প্রজার নাম বেণী সাহা। তামাদি হওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এ দেনা শোধ করে দেন। (মাসিক বসুমতী, ভাদ্র, ১৩৪৮)

---

১ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৮৫, পত্রসংখ্যা ১৫৪

২ চিঠিপত্র ৮, পৃঃ ১৮০, পত্রসংখ্যা ৬০

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

বাংলার ইতিহাসে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি এদেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ। একদিকে ব্যবসা অপরদিকে জমিদারি, বিরাহিমপুর পরগণা ছিল তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। এ ছাড়া নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের বহু সম্পত্তি তিনি নীলামে কেনেন। শুনা যায় তাঁর জমিদারীর আয় বছরে ১২ লক্ষ টাকা ছিল।

সম্পত্তির তালিকা[১] (১৮৪০):

(১) বিরাহিমপুর পরগণা—সদর-শিলাইদহ (নদীয়া)

(২) কিসমৎ তালুক সাদকী

(৩) তালুক কালিগ্রাম—সদর-পতিসর (রাজসাহী)

(৪) তালুক সাজাদপুর—(পাবনা)

(৫) মৌজা—সাঁৎ বা পাণ্ডুয়া (উড়িষ্যায়, কটকের কাছে)

(৬) মৌজা—বালিয়া (উড়িষ্যায়)

(৭) মৌজা—হরিহরপুর

(৮) মৌজা—পাঁজপুর

এই সম্পত্তির উল্লেখ দ্বারকানাথের ১৮৪০ সালের উইলের মধ্যে পাওয়া যায়।

এর প্রায় ৫০ বছর পরে যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন উত্তরবঙ্গে তিনটে পরগণার কথা পাওয়া যায়।[২]

(১) বিরাহিমপুর—কাছারি শিলাইদহে

---

১ রবিকথা—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

২ রবীন্দ্রজীবনী-১ম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৬

(২) কালিগ্রাম—কাছারি পতিসরে

(৩) সাজাদপুর

এ ছাড়া উড়িষ্যার জমিদারীও ছিল।

রাজশাহী জেলার কালিগ্রাম পরগণায় যে সম্পত্তি ছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় 'রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ'-এ[১] :—

"রাজসাহী ও বগুড়া জেলার আত্রাই, রঘুরামপুর, রাণীনগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদীঘি, নসরৎপুর ও তানোরা এই কয়টি রেল স্টেশনকে ঘিরিয়া এই পরগণা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেকশত মাইল ব্যাপিয়া।" ১৯২০ সালে সম্পত্তি যখন ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় তখন রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির উইল অনুসারে তিন আনা তের গণ্ডার মালিক হন। কালিগ্রাম পরগণা তাঁর অংশে পড়ে।

দ্বারকানাথ অত্যন্ত বেহিসেবী ছিলেন। অর্থকে কোনদিনই তিনি অর্থ বলে মনে করতেন না। যার ফলে, শুনা যায়, তিনি ১ কোটি টাকা দেনা রেখে মারা যান। এর মধ্যে পাওনা ছিল ৭০ লক্ষ টাকা, ৩০ লক্ষ টাকার অসংস্থান। এই ৩০ লক্ষ টাকার দেনা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহর্ষিদেব। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন,[২] "দেবেন্দ্রনাথের বিষয় ছিল, কিন্তু বৈষয়িকতা ছিল না; তাই বলিয়া বিষয়-বুদ্ধির অভাবও ছিল না। বিষয়-বুদ্ধি না থাকিলে—বিদেশে পিতা দ্বারকানাথের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর পর যুবক দেবেন্দ্রনাথ যেভাবে উত্তমর্ণদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া হৃতসর্বস্ব হইয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করিয়া পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। পিতার সমস্ত ঋণ, এমনকি পিতার প্রতিশ্রুত

১ শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৪৮, পৃঃ ৯০৯

২ রবীন্দ্রজীবনী-১ম, পৃঃ ২৭৬

দানের টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করিয়াছেন ; তারপর ধীরে ধীরে আবার সম্পত্তি গড়িয়া তোলেন।” প্রভাতকুমার 'হৃতসর্বস্ব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে সংসারের সব রকম আড়ম্বর বিলাস-বাহুল্য তিনি বর্জন করেছিলেন। মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ করে বলতে শুনি,[১] “পিতামহের ঐশ্বর্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহন শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটি মাত্র কম্পমান শিখা।……আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।”

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যান আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৯০, কিন্তু মাসখানেক থেকেই দেশে ফিরে আসেন (নভেম্বর, ১৮৯০)। ফিরবার অল্পকাল পরেই মহর্ষিদেব রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারী পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। ইতিপূর্বে মাঝে মাঝে অস্থায়ীভাবে তিনি জমিদারী পরিদর্শনের জন্যে বেরিয়েছেন বটে কিন্তু এবার পাকাপাকিভাবেই তাঁকে পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হোলো। কবির বয়স তখন মাত্র ৩০ (১৮৯১)। কিন্তু জমিদারীর কাজে তিনি নূতন নন। কারণ পিতার নির্দেশে কলকাতার সেরেস্তায় বাইশ বৎসর বয়সেই জমিদারীর সব রকম কাজই তাঁকে শিখতে হয়েছিল। তবু ও একথা ভুললে চলবে না যে তিনি কবি, কল্প-রাজ্যে তাঁর বিচরণ। কিন্তু বিরলপ্রতিভার অধিকারী কবি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিলেন জমিদারীর কাজে। সে পরিচয়ে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখিনা, জমিদার রবীন্দ্রনাথকেও না, দেখি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে।

১ আত্মস্মৃতি, পৃঃ ৭১

একদিন মংপুতে কথাপ্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীকে কবি বলেন,[১] "আচ্ছা কেন তোমরা বল যে আমি কল্পরাজ্যের কবি, দেশের মাটির দিকে আমার দৃষ্টি নেই? বাংলা দেশের গ্রাম আমি জানিনে, দরিদ্র সাধারণ বাঙালী জীবন জানিনে আমি, সে ছবি আঁকি নি? ......বাংলা দেশের গ্রাম আমি দেখিনি এটা সত্যি নয়—বাংলা দেশের গ্রাম আমি অতি গভীরভাবে দেখেছি, দেখেছি তার আনন্দ, তার বেদনা। বোটে থাকতে দেখাই তো আমার কাজ ছিল।" একথা যে কতদূর সত্য তার পরিচয় পাই আমরা কবির সেই সময়কার লেখা চিঠিপত্রে, ছোটগল্পে ও কবিতায়। শিলাইদহ থেকে ১০ই মে ১৮৯৩ সালে ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে লিখছেন,[২] "আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায়, তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে—কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই তখনি সব ভুলে যায়। সোস্যালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য। কেননা পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখ মোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনোকালে পৃথিবীর সকল

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৬৫, ১৬৭

২ ছিন্নপত্র, পৃঃ ১৫৮

মানুষকে জীবন ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনই সকল মানুষ খেতে-পরতে পারেনা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই, তারা ভারি কঠিন কথা বলে।”

আমাদের দেশে চাষীদের ভাগ্য সর্বকালেই অনিশ্চিত। প্রকৃতির কৃপার ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। খুব কম সময়ই সেই কৃপা মেলে। হয় অনাবৃষ্টি—ফসল যায় পুড়ে, নয় অতিবৃষ্টি—ফসল যায় ডুবে। হতভাগ্য চাষীর ঘরে ওঠে হাহাকার। পাষাণ হৃদয় জমিদার তার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু অভিজাত পরিবারের যুবক জমিদার রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে চাষীদের এই দুর্ভাগ্য কিভাবে স্পর্শ করেছে এই চিঠিখানা থেকে তা বুঝা যায়। শিলাইদহ থেকে ৪ঠা জুলাই, ১৮৯৩ ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন,[১] “এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে—আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি—যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়, যদি ঐ শীষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা।……এই শতসহস্র নির্দোষ হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছেনা, বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী

১ ছিন্নপত্র, পৃ: ১৭১

যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই।"

কলিকাতা থেকে ২১শে আগস্ট, ১৮৯৩ সালে একখানা চিঠিতে লিখছেন,[১] "আজ কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচিছাটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালিগ্রামের সরল চাষী-প্রজাদের দুঃখদৈন্য নিবেদন। আমার কাছে এই সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল বিশ্বাস-পরায়ণ-অনুরক্ত প্রজাদের মুখে বড়ো একটি কোমল মাধুর্য আছে, বাস্তবিক এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত-নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে একটা সুখ আছে, এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না।"

জমিদার ওপর তলার মানুষ। সুতরাং প্রজার দুর্গতির খবর তিনি রাখেন না। কিন্তু ওপর তলার মানুষ হয়েও প্রজার দুঃখ-দারিদ্র্যের কোন খবরই তাঁর অজানা ছিল না। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সালে একখানা চিঠিতে তিনি লিখছেন,[২] "যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি

১ ছিন্নপত্র, পৃঃ ১৮৯

২ ছিন্নপত্র, পৃঃ ২৩৭

বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়—তখন সে দৃশ্য কোনো মতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাত ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছেনা—এত অবহেলা অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়, সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে-সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।”

মানুষের এই বেদনা একদিন মূর্ত হয়ে উঠলো “এবার ফিরাও মোরে” কবিতায়,[১] “……কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে

> শূন্যতল? কোন অন্ধ কারা মাঝে জর্জরবন্ধনে
> অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
> অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
> লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
> স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
> লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
> বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—

১ চিত্রা, পঃ :৫

তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি';
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ—
রেখে দেয় বাঁচাইয়া! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে!......"

বাংলা দেশের স্বার্থপর কুটিল, চক্রী জমিদারের চিত্র এঁকেছেন "দুই বিঘা জমি" কবিতায়।[১] প্রজার সম্বল মাত্র দু বিঘা জমি। জমিদার, সেটুকু চান। কারণ এই দু বিঘা জমি পেলে তাঁর 'বাগানখানা' 'প্রস্থে ও দৈর্ঘে সমান হইবে টানা।' প্রজার আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হোলো।

"পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

বাংলাদেশের জমিদার চাইতো প্রজা যেন মূর্খ হয়েই থাকে, চোখ যেন তাদের না ফোটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন,[২] "......এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে

---

১ চিত্রা, পৃ ৫৫

২ চিত্রা, পৃঃ ১৬

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে !"

জমিদার ও প্রজা। শোষক ও শোষিত। কিন্তু কেমন করে প্রজাদের কল্যাণ সাধন করা যায় এই ছিল তাঁর চিন্তা। শুধু চিন্তা নয়, সাহস করে কাজেও নেমেছিলেন। বিরাট সে পরিকল্পনা কাজ আরম্ভ হয় কালিগ্রাম পরগণায়। উদ্দেশ্য পাঁচটি[১] —(১) চিকিৎসার ব্যবস্থা, (২) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, (৩) পানীয় জল, রাস্তা সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, (৪) ঋণ থেকে চাষীকে রক্ষা করা, (৫) সালিশী বিচার। এই পরিকল্পনানুসারে তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপিত হয়। বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা চলতে থাকে। দু-একটা 'বেড'ও ছিল। এ বাবদে প্রাপ্য খাজনার টাকা পিছু এক আনা দিতেন রবীন্দ্রনাথ, এক আনা দিত প্রজারা। অপরাধী প্রজার কাছ থেকে কিছু জরিমানা আদায় করেও এই ফাণ্ডে জমা করা হোতো।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে দুশোর উপর নিম্ন প্রাথমিক

১ শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৪৮

বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। কতকগুলো বিদ্যালয় দিনে বসত, কতকগুলো রাত্রে প্রজাদের সুবিধার জন্যে।

প্রজারা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা পুকুর ও কূপ খনন, রাস্তা সংস্কার, জঙ্গল সাফ এইসব কাজ করতে লাগল।

অভাবগ্রস্ত প্রজারা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতো। কিন্তু সে ঋণ তাদের কোনোদিনই শোধ হোতো না। রবীন্দ্রনাথ স্টেট্ থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

প্রজাদের মধ্যে যখনই কোন কলহ দেখা দিত—রবীন্দ্রনাথ তার মীমাংসা করে দিতেন। আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন হোতো না।

এইভাবে কবি রবীন্দ্রনাথ কর্মী রবীন্দ্রনাথরূপে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর এইসব কাজে প্রধান সহায় ছিলেন অতুল সেন। অতুলবাবুকে লেখা একখানা চিঠি থেকে কবির তৎকালীন মনোভাব স্পষ্টতর হবে। শান্তিনিকেতন থেকে অতুলবাবুকে উৎসাহ দিয়ে লিখছেন,[১] "এই ত চাই। এমনি করিয়া কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্তিতে আছে—এখনি তোমার কাজের আসর জমিবে ভাল। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভবিষ্যতে হইবে—এখন পালে হাওয়া লাগিয়াছে—হু হু করিয়া চলিয়া যাও। কোনো বাধাই টিকিবে না। কিন্তু মনটাকে ঠাণ্ডা রাখিয়ো—উন্মাদনাও ভাল নয় অবসাদও ভাল নয়—যাহা ঘটিতেছে তুমি তাহার উপলক্ষ্য মাত্র একথা মনে রাখিয়ো। আবার যদি গড়া জিনিস কখনো ভাঙে তখনো অবিচলিত থাকিতে হইবে। মনটাকে কাজের ক্ষেত্রের বহু ঊর্ধ্বে রাখিলে তবেই কাজে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। লেশমাত্র

১ শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৪৮

অহমিকা যেন তোমাকে না আক্রমণ করে। যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া কাজ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দের সঙ্গে তাহার সাহায্য করে। যেই তুমি বলিবে আমি করিতেছি অমনি একলা পড়িবে।" ইনিই হচ্ছেন কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সব বানচাল হয়ে গেল। অতুল সেন রাজরোষে পড়ে অন্তরায়িত হলেন। "ইহাতে এই কাজের ভরা পালে যে ফুটা হইল, নৌকাডুবি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।"[১]

সেই সময় জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর জমিদারী পরিচালনা সম্পর্কে সরকারী শাসন বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা নীচে তুলে দেওয়া হোলো ঃ[২]

Extract from "Bengal District Gazetteers, Rajshahi"

By Mr. L. S. S. O'Maney (1916)

It must not be imagined that a powerful land-lord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengal poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate

১ শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৪৮

২ রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ৯৯

management, which should be an example to the local Zemindars.

"A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sri Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Subinfeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahsildars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office. Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Registration of transfer is granted on a fixed fee, but is refused in the case of an undesirable transferee. Remissions of rent are granted, when inability to pay is proved. In 1312 B.S. it is said that the amount remitted was Rs. 57,595. There are Lower Primary Schools in each division, and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the Estate contributes annually Rs. 1,250 and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual

grant of Rs. 240 for the relief of cripples and the blinds. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 per cent. per annum. The depositors are chiefly Calcutta-friends of the poet, who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000 invested in loans."

কবি প্রজাদের প্রতি যেমন ছিলেন স্নেহশীল, কর্মচারীদের প্রতি তেমন ছিলেন কঠোর। কর্তব্যে শৈথিল্য, প্রজাদের উপর উৎপীড়ন তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতেন না। সদর অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর সেরেস্তা থেকে যখন ডাক আসত তখন সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়তো, কি জানি কার বরখাস্তের আদেশ আসে। জনৈক কর্মচারী একবার বলেছিল, "আপনারা কলিকাতায় কেবল প্রভাত রবিকে দেখিতেছেন, কিন্তু মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের পরিচয় পাইতে হইলে একবার জমিদারীতে আসিবেন।"

কর্মচারী সতীশ ঘোষকে লিখছেন,[১] ডাক নজর অনুসারে জমির নজর খাজনা আদায়ের বৎসর এ নহে। প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায় তহশীল করা শ্রেয়।......সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা সর্বদা যে প্রজাদের হিত করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।......"প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে। কর্মচারীদের কোন প্রকার শৈথিল্য বা

১ রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ১৩

নিয়মভঙ্গ আমি কখনই মার্জনা করিব না।” (২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫)

কয়েকদিন পরে এই কর্মচারীকে পুনরায় লিখছেন,[১] “......যাহাতে প্রজাদের হিতকার্য করা হয় এই দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে।” (২রা আষাঢ়, ১৩১৫)

প্রজাদের যে তিনি কেবল ভালই বাসতেন তাই নয়। তাদেরও যে মান-সম্ভ্রম আছে তারাও যে মানুষ এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একদিন ম্যানেজারকে বলছেন,[২] “জমিদার সরকারের মান-সম্ভ্রম তো তোমাদের হাতেই রক্ষা করার ভার দেওয়া হয়েছে। সে মান যে তোমরাই নষ্ট করতে বসেছ। আমার প্রজারও তো মান-সম্ভ্রম আছে। সে কথাটা বুঝি মনেও আসে না?” আর একদিন বলছেন,[৩] “প্রজার মান দিয়েই জমিদারের মান। খবর্দার, নিজের দোষে, নিজের কাজের ত্রুটিতে কোন কারণেই প্রজার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করো না।”

একবার চন্দ্রময়বাবু নামক জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোককে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্টেটে পেশকারের পদে নিযুক্ত করলেন, চন্দ্রময়-বাবুকে বলছেন,[৪] “আমি এই রকম লোকই চাই। জমিদারী সেরেস্তার বহুযুগের কলঙ্ক মোচনের জন্য তোমাদের মত সুশিক্ষিত যুবকই আমি খুঁজে বেড়াই।...শুধু জমিদার নয়, প্রজার মঙ্গলের জন্যও সর্বদা চেষ্টা করবে।”

---

১ রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ১৩
২ পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ৪১
৩ পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ৪২
৪ পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ৪৫

কর্মচারীদের কর্তব্যপালনের দিকে যেমন তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাদের স্বার্থের প্রতিও তেমনি। কর্মচারীরা তাদের কাজের জন্যে পুরস্কৃত হত। এখন যে 'বোনাস' কথাটা শুনি, বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্টেটে সেটার প্রচলন করেন। পূজার সময় এক মাসের বেশী বেতন কর্মচারীদের দেওয়া হ'তো। পেন্সনের ব্যবস্থাও ছিল।

সব কিছুরই পিছনে ছিল প্রজার কল্যাণ চিন্তা। তাদের দুর্দশা সর্বদাই তাঁর অন্তরে বেদনা দিয়েছে। তাই প্রায়ই তিনি ম্যানেজারকে বলতেন,[১] এই গরীব চাষীরা প্রায়ই কলাই সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটায়, একজনের ভাত তিন জনে বেঁটে খায়, শীতকালে খড়ের গাদায় রাত কাটায়, চরের শুকনো ঝাউ দুই ক্রোশ দূরে বয়ে বেচে চারটি মাত্র পয়সা পায়,—আমি অনেক দেখেছি নিজের চোখে। এদের উপর যেন কোন রকমেই অত্যাচার না হয়। এদের পালন করাই তোমাদের ধর্ম। ধর্ম ব'লে আর কোন জিনিস নেই জেনো।"

প্রজার দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ যে জমিদারের শোষণ নীতি রবীন্দ্রনাথ সেটা বুঝতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে ম্যানেজার এডওয়ার্ড সাহেবকে বলছেন,[২] "এখানে প্রজা আছে, তাও গরীব প্রজা, আমরা নানা উপায়ে তাদের গরীব করে রেখেছি" ম্যানেজার জানকী রায়কে একখানা চিঠিতে লিখছেন,[৩] "আমি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না।

১ সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ৮

২ রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ২২

৩ রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ৬৯

অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের উপর নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্তব্যপালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে।"

প্রজাকে ও জমিদারকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীর লেখা রায়তের কথার ভূমিকায়।[১] —"দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে, মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্ছে—যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে, হাসছে আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বলছে 'অদৃষ্ট'!........."আমার জন্মগত পেশা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরে প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারামাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।"[২]

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ গেলেন রাশিয়ায়। সেখানে চাষীদের

১ রায়তের কথা—ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৩-৪ (আষাঢ়, ১৩৩৩)

২ রায়তের কথা—ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃঃ ৯-১০

অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত ও চমৎকৃত হলেন। তিনি দেখলেন, একদিন তিনি তাঁর জমিদারীতে প্রজাদের কল্যাণের জন্যে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাহা কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার দরুণ কৃতকার্য হতে পারেন নি, রাশিয়া সে বিষয়ে সফলকাম হয়েছে। একখানা চিঠিতে লিখছেন,[১] "কেবলই ভাবছি আমাদের দেশ-জোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের প্রারম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখা-শোনা—ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে, সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছায়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়। ·········চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর ;······"

আর একখানা চিঠিতে লিখছেন,[২] "কাগজে পড়লুম, সম্প্রতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন উপলক্ষ্যে হুকুম পাস হয়েছে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েছে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ, যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছে শিক্ষার ছুতো করে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া।

শিক্ষা-কর চাই বৈকি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর

১ রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ২১-২২

২ রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ৬৬-৬৭

দেবে না? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারি সার্ভিস আছে, গভর্নর, ভাইস্‌রয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেন্‌সন্ নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না? পাটকলের যে-সব বড়ো বড়ো বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত নিয়ে মোটা মুনাফা সংগ্রহ করে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের কোনই দায়িত্ব নেই? যে-সব মিনিষ্টার শিক্ষা-আইন পাস নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কানাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না?

একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ? আমি তো একজন জমিদার, আমার প্রজাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কিছু দিয়েও থাকি; আরও দ্বিগুন তিনগুণ যদি দিতে হয় তো তাও দিতে রাজি আছি। "কিন্তু এই কথাটা প্রতিদিন ওদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হবে যে, আমি তাদের আপন লোক, তাদের শিক্ষায় আমারই মঙ্গল— এবং আমিই তাদের দিচ্ছি, দিচ্ছে না এই রাজ্যশাসকদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণীর একজনও এক পয়সাও।"

ঐ সময়ই (১৯৩০) প্রতিমা দেবীকে লিখছেন,[১] "বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়—আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো।" আর একখানা চিঠিতে রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন,[২]

১ চিঠিপত্র—৩

২ চিঠিপত্র—২

"জমিদারির কথা লিখেছিস।...ও জিনিসটার ওপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। সে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম, তাই জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধহয়।" রাশিয়া তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কারণ সেখানে তিনি দেখেছিলেন তাঁরই আদর্শকে তারা রূপায়িত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত। মানুষের মাঝ থেকে তারা সর্বপ্রকার বৈষম্যকে দূর করে দিতে চায় যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কবি সব সময়ই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করবার পর প্রথম পুণ্যাহ অনুষ্ঠান শিলাইদহে।[১] পুণ্যাহ সভায় জাতি-ধর্ম-মর্যাদা অনুসারে প্রজাদের বসবার ব্যবস্থা। জমিদারের জন্যে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত আসন। রবীন্দ্রনাথ সভায় প্রবেশ করে লক্ষ্য করলেন এই তারতম্য। বললেন, এ ব্যবস্থা এখনই তুলে দিতে হবে। সকলে আজ আমরা এক আসনে বসব। নায়েব মশাই বুঝাবার চেষ্টা করলেন—বরাবর এই রকম ব্যবস্থাই চলে আসছে প্রিন্স এবং মহর্ষিদেবের আমল থেকে। এর ব্যতিক্রম হলে জমিদারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। রবীন্দ্রনাথ তবুও অচল, অটল। শেষপর্যন্ত সব সরিয়ে ফেলা হোলো। ফরাস পাতা হোলো। কেবল মাত্র জমিদারের জন্যে একটা গালিচা ও একটা তাকিয়া দেওয়া হোলো।

সকল শ্রেণীর প্রজাদের সঙ্গে তিনি অসংকোচে মিশতেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন, তাদের অভাব অভিযোগ শুনতেন, তার প্রতিকার করতেন। প্রজারা দেবতার মতো তাঁকে ভক্তি

১ সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃঃ ২০

করত। তাই তো দেখি, বুড়ো ডাকাতের সর্দার পাশের জমিদারের পাঁচশো প্রজাকে ধ'রে নিয়ে এসে বলে,[১] 'নিয়ে এলুম এদের, আমাদের কর্তাকে একবার দেখে যাক্। এমন চাঁদ মুখ তোরা দেখেছিস্।' তাই পাল্কী থামিয়ে পায়ের কাছে একটা টাকা নজরানা রেখে প্রজা বলে, 'দেব না, আমরা না দিলে তোরা খাবি কি?'

অদ্বিতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ, জমিদারও অদ্বিতীয়। "পূর্ববঙ্গের কোনো জমিদারের মুখে শুনিলাম যে, জমিদারিবিদ্যায় ও বিষয়-বুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য জমিদার সে যুগে ছিল না," লিখেছেন প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে।[২] সত্যই তাই।

---

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ীদেবী, পৃঃ ১৯৪-৯৫

২ রবীন্দ্রজীবনী-১ম, পৃঃ ২৭৬

কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রের মৃত্যু ঘটে জার্মানীতে। একদিন এই সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। কবি সেই সময় বলেছিলেন,[১] "বেশী দিন বাঁচা কিছু নয়। সময়-লঙ্ঘনের দণ্ড পেতে হবে বৈ কি!" কবি বেঁচে ছিলেন আশী বছর। এই সুদীর্ঘ আশী বৎসরের জীবনকালে প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বহু শোক তাঁকে বহন করতে হয়েছে। সবই তিনি গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন সহজভাবে। মা সারদাদেবী, নূতন বৌঠান কাদম্বরী দেবী, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ, শ্রীমৃণালিনী দেবী, মধ্যমা কন্যা রেণুকা, পিতা দেবেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ, মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এঁদের সকলের মৃত্যু-শোক তাঁকে বহন করতে হয়েছে।

সারদা দেবী ছিলেন চতুর্দশ সন্তানের জননী। ফলে সকল সন্তানের পক্ষে সমভাবে মাতৃ-সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ ঘটে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের তো মোটেই নয়। তিনি মানুষ হয়েছিলেন মা'র কাছ থেকে দূরে 'ভৃত্যরাজক তন্ত্রে'। কবির মনে তার জন্যে কোন অভিমান ছিল কি না জানি না। তবে 'ছিন্নপত্রে' একজায়গায় লিখছেন,[২] "বহু সন্তানবতী মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণু ভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি···।" সারদা দেবীর মৃত্যু হয় ১০ই মার্চ, ১৮৭৫। কবির বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখছেন[৩]—

১ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১১

২ ছিন্নপত্র—সংখ্যা ৬৭, পৃঃ ১৩৯

৩ জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১৪২-৪৩

"ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মা'র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প।··· যে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,···।···স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া ওঠায় হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল, কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান, কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না, সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখ-সুপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোহর।······কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।" কিন্তু এই শোক কবির মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে নি। তার কারণ কবির নিজের কথাতেই বলি—"যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণ-শক্তির একটা প্রধান অঙ্গ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে

না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দ পদে চলিয়া গেল।” কিন্তু এর পরবর্তী যে শোক যা একান্তই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, রহস্যময় ও মর্মান্তিক, কবি যা পেয়েছিলেন তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে মন থেকে সে শোককে জীবনে মুছে ফেলতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয় কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৯, কাদম্বরী দেবীর ৯। রবীন্দ্রনাথ তখন ৭ বৎসরের বালক। মায়ের মৃত্যুর পর কিশোর দেবরের ভার গ্রহণ করেন কাদম্বরী দেবী, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলতেন 'নতুন বৌঠান' রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের প্রারম্ভে কাদম্বরী দেবীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন চিত্তে আজীবন স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স ২২, শ্রীমৃণালিনীর ১১। এই বিবাহ হয় ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩। কাদম্বরী দেবীর বয়স তখন ২৪ উত্তীর্ণ হয়েছে। বিবাহের ৪ মাস পরে ১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৪ কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন। কবি জীবনস্মৃতিতে লিখছেন।[১] “কিন্তু, আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল, তাহা স্থায়ী পরিচয়।” কাদম্বরী দেবীর কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। বলাকার 'ছবি' কবিতার ইতিহাস সম্পর্কে অনেকে বলেন এটা কাদম্বরী দেবীর ফটো দেখে লেখা। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আচার্য ক্ষিতি-মোহন সেনের মতে মৃণালিনী দেবীর ফটো দেখে কবি এই কবিতাটি

১ জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১৪৩

লেখেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকৃপালনি জানিয়েছেন—"I had once asked Gurudev directly as to whether the poem 'Chhabi' in Balaka was inspired by Mrinalini Devi's portrait. He replied, "no. The poem was addressed to 'Natun Bouthan's' photograph." অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ কবির কাছে শুনেছেন ১৩২১ সালে এলাহাবাদে কবির ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির বাড়ীতে কাদম্বরী দেবীর ফটো দেখে কবি এই কবিতাটি লেখেন। আমাদেরও তাই মনে হয়।

১৯০২ সালের আগস্ট মাস। কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। ২৩শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হোলো। কবির বয়স তখন ৪১, মৃণালিনী দেবীর ২৯। স্ত্রীর মৃত্যু-জনিত শোকের কথা কবি কোথায়ও প্রকাশ করেন নি। একমাত্র 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থই তাঁর এই নিদারুণ শোকের মূর্ত প্রকাশ। এই দুর্ঘটনার মাস তিনেক পরে মধ্যমা কন্যা রেণুকা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হোলো। পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে কবি গেলেন হাজারিবাগ, সেখান থেকে আলমোড়া। ফিরে এলেন কলকাতায়। বাঁচাতে পারলেন না। ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ রেণুকার মৃত্যু হোলো। রেণুকার মৃত্যু-শোক কবি কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের লেখার মধ্যে,[১] "সে সময়…রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অসুখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিড়ির

১ চিঠিপত্র ৬, পৃঃ ২২৪

(কবির মধ্যমা কন্যার মৃত্যু আগে হয়, তাহার পর জ্যেষ্ঠা কন্যার)

কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছে? কবি শুধু বললেন, সে মারা গিয়েছে। শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।"

এর পর আর একটি নিদারুণ আঘাত কবির জন্যে অপেক্ষা করছিল। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র বন্ধুর সঙ্গে মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে কলেরা তাকে আক্রমণ করে। সংবাদ পেয়ে কবি ছুটলেন সেখানে। কিন্তু শমী চলে গেল।[১] এই নিষ্ঠুর আঘাত তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়েছিল। যে রাত্রে শমীর মৃত্যু হয় অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখছেন,[২] "যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই শমীর জীবন প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই রহিয়াছেন। এ ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতে যাওয়ার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ সময়ের যাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম, এখন অবশেষে যাহা কর্তব্য আপনি করুন।...আমরা দাহান্তে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রস্তরের মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। কোমলপ্রাণ শ্রীশবাবু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমি ও শ্রীশবাবু তখন রবীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্রীশবাবু অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। চক্ষে তাঁহার ধারা আর থামে না, আমারও চক্ষে ধারা বহিতেছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথেরও চক্ষে ধারা

১ শমীর মৃত্যু—১৯০৭

২ দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯

বহিতে লাগিল। "সেই রাত্রেই সকলে মুঙ্গের থেকে শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন। ভূপেনবাবুর খাবার মামা নিয়ে সাহেবগঞ্জ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কবি তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিক এবং সহজভাবেই আলাপ করেন। বুঝবার উপায় নেই পূর্ব রাত্রেই এত বড়ো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে পরদিন সকালে কবি ভূপেনবাবুকে ডেকে পাঠালেন। ভূপেনবাবু লিখছেন, "…একটু কথা কহিতে গিয়াই তাহার নেত্র আর্দ্র হইয়া আসিল ; কণ্ঠস্বরও যেন বাহির হইতেছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল তাঁহার পিঠটিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মধ্যে মধ্যে 'রবি', 'রবি' এই শব্দ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্যটি বড় করুণাপূর্ণ।" "শমীর মৃত্যুর পর কবি তাঁর প্রবাসী বন্ধু মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছেন, "যে সংবাদ শুনিয়াছেন (শমীর মৃত্যুসংবাদ) তাহা মিথ্যা নহে। ভোলা[১] মুঙ্গেরে তাহার মামার বাড়ীতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ করিয়া সেখানে বেড়াতে গেল—তাহার পর আর ফিরিল না।" শমীর মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে দৌহিত্র নীতুর মৃত্যুতে কন্যা মীরাদেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার দুজায়গায় আছে, "যে রাত্রে শমী চলে গিয়েছিল…," "শমী যে রাত্রে গেল…"। আর এখানে, "…তাহার পর আর ফিরিল না,…" এই কয়েকটি কথার মধ্যে পুত্রহারা পিতার যে মর্মবেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাকে কেবল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা চলে—বুঝানো যায় না, প্রকাশ করা যায় না।

---

১ ভোলা—কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সরোজচন্দ্র
শ্রীশবাবু—কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১৯০৭ সালের পূজার ছুটিতে শমী কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী বেড়াইতে যায়। সেখানে তার কলেরা হয়। খবর পেয়ে কবি সেখানে যান। "...হঠাৎ একদিন তার আসিল "Shami succeeded last night Rabindra Babu reaches Bolpur this night. (succeeded এর' পরিবর্তে মনে হয় succumbed হবে।)

বোলপুর পৌঁছে কবি কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেন। যতীনবাবু লিখছেন—"কাজেই আমরা সেদিন কেউ তাঁর বাড়ির দিকে গেলাম না। পরের দিন সকালে দেখি তিনি নিজেই শাল বীথিকার তলা দিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। আমরা গিয়া তাঁকে প্রণাম করিলাম। তিনি স্কুলের সম্বন্ধে নানারকম খোঁজখবর লইতে লাগিলেন—মাঝে মাঝে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে হাস্যপরিহাসও করিলেন।...এর কয়েকদিন পরে একদিন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখি দেহলীর বাড়ীর নীচের বারান্দায় বাঁধের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। আমি যাইতে বলিলেন, "আমি ভাবছি শমীর কাপড় চোপড়গুলি তোমার ভুবনডাঙ্গার ছাত্রদের দিয়ে দেবো।"...তারপর দিন আফিস ঘরে কাপড়ের একটি পুঁটলি আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি চোখের জল রাখিতে না পারিয়া পুঁটলি লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। তাঁকে কিন্তু একদিনও বিচলিত হইতে দেখি নাই।[১]

১৯০৮ সালে রেণুকার স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলো। সেই সঙ্গে রেণুকারও সমস্ত স্মৃতি ইহলোক থেকে

১ দেশ, ১৩৪৯, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুছে গেল। কবি তাঁর প্রবাসী বন্ধু মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানা চিঠিতে লিখছেন, "সত্যেন্দ্র রেণুকার মৃত্যুর পর এতদিন বোলপুরেই কাজ করিতেছিল। অন্ত মাস পাঁচ-ছয় হইল আমিই চেষ্টা করিয়া আবার তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। এইবার পুজোর ছুটিতে আমাদের কোনো কোনো অধ্যাপক পশ্চিমে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন—দিনুও গিয়াছিল। সত্য কাহারও নিষেধ না মানিয়া কাজকর্ম ফেলিয়া তাঁহাদের দলে ভিড়িয়া গেল। লাহোর পর্যন্ত গিয়া তাহাকে ও দিনুকে জ্বরে ধরিল। দিনু চিকিৎসায় রক্ষা পাইয়া গেল। সত্যেন্দ্র তিন চার দিনের জ্বরে ভুগিয়া নব বধূকে অনাথা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বিদায় লইয়াছে। মৃত্যুর লীলা—অনেক দেখিলাম।"

দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু হোলো ১৩ই মে, ১৯১৮। কবি অসুস্থা কন্যাকে রোজই দেখতে যেতেন তার শ্বশুরালয়ে। সঙ্গে থাকতেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ। মৃত্যুর দিনও গিয়েছেন। কিন্তু পৌঁছে মৃত্যুসংবাদ পেয়েই ফিরে আসেন। বেলার মৃত্যু শোক কবি কিভাবে গ্রহণ করেন অধ্যাপক মহলানবিশের লেখায় তার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়,[১]—"......কবি জোড়াসাঁকোয়। মেয়েকে দেখবার জন্য রোজ সকালে তাঁকে গাড়ী করে নিয়ে যাই, কবি দোতলায় চলে যান। আমি নিচে অপেক্ষা করি। ......রোজ যেমন যাই একদিন সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌঁছলুম। সেদিন আমি গাড়ীতে অপেক্ষা করছি। কবি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে গাড়ীতে চড়ে বসলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন,

১ চিঠিপত্র ৬, পৃঃ ২২২-২৩

'আমি পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি।' গাড়ীতে আর কিছু বললেন না। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছিয়ে অন্য দিনের মতো আমাকে বললেন, 'উপরে চলো।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে ও চলে যাবে। তবু রোজ সকালে গিয়ে ও'র হাতখানা ধরে বসে থাকতুম। ছেলেবেলার মতো বলতো, বাবা, গল্প বলো। যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হোলো।' এই বলে চুপ করে বসে রইলেন। শান্ত সমাহিত। সেদিন বিকেলে ওঁর একটা কাজ ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে? বললেন, 'না, বদলাবে কেন? তার কোনো দরকার নেই।' এ সম্পর্কে সীতা দেবী লিখছেন,[১] মুখের চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, যেন অনেক-দিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে খানিক পরে দুই চারিটি কথা বলিলেন, তবে মধ্যে মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। কি একটা কথায় একটু হাস্য করিলেন, হাসিটা তাঁহার মুখে কি নিদারুণ করুণ দেখাইয়াছিল তাহা এই চব্বিশবছর পরেও মনে আছে।"

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দীর্ঘকালের সঙ্গী, শান্তিনিকেতনের কর্মী ও অধ্যাপক পিয়ার্সনের মৃত্যু ঘটে ইতালিতে ট্রেন দুর্ঘটনায়।

১৯২৫ সালের মার্চে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মারা গেলেন রাঁচিতে।

পরের বৎসরে মৃত্যু হোলো দ্বিজেন্দ্রনাথের। ১৯২৯এর নভেম্বরে দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ মারা গেলেন। এ সম্পর্কে একখানা

১ পুণ্যস্মৃতি—পৃঃ ৩৫২

চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন,[১] "আজ সকালে সুধীরের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। আমরা কেউ জানতে পারিনি যে তার সাংঘাতিক পীড়া হয়েছে। যে ডাক্তার ওকে দেখছিল সে নিশ্চয়ই ঠিক বুঝতে পারেনি। তিনদিন আগে খুব হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিল, আমার কাছ থেকে ওষুধ খেয়ে সেটা সেরে যায়। তার পরেই হঠাৎ আজ এই বিপদ।"

এর পর কবি তাঁর জীবনের শেষ ও চরম আঘাত পান তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে। নীতীন্দ্রের বয়স তখন কুড়ি। কবি নিজেই চেষ্টা করে তাকে জার্মানীতে পাঠান মুদ্রণ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানেই তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। পুত্রের অসুখের সংবাদ পেয়ে মীরা দেবী সেখানে যান। কবি তখন বরানগরে অধ্যাপক মহলানবিশের বাড়ীতে। নীতীন্দ্রের মৃত্যু হয় ৭ই আগস্ট। এ সম্পর্কে শ্রীমতী মহলানবিশ লিখছেন,[২] "সেদিন (সম্ভবতঃ ১৪ই আগস্ট, কারণ পরে লিখছেন, ' ছ'দিন আগে ৭ই আগস্ট ') ভোরে কবির ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই, কেন জানি না নিজে থেকেই মৃত্যু সম্বন্ধে কথা তুললেন, বললেন," ছাখো, সকালে বসে এতক্ষণ ভাবছিলুম জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও ততটা সত্য···ভাঙাকে থামিয়ে দিলে, গড়াও বন্ধ হয়ে যায়।···তাই যখন দেখি কেউ শোকটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে, আমার খুব খারাপ লাগে, কারণ সেটা সত্য নয়, ক্ষত যতই গভীর হোক না কেন, মহাকালের

---

১ ৮ই নভেম্বর, ১৯২৯

২ বাইশে শ্রাবণ, পৃঃ ২৭

নীতীন্দ্র—ডাকনাম নীতু অথবা নিতু, উভয় বানানই দেখা যায়।

প্রলেপ তাতে পড়বেই পড়বে।...কাল এণ্ডরুজের চিঠি পেয়ে অবধি নীতুর জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, যদিও তিনি লিখেছেন ও এখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। "ওঁর ঘর থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে এসেই খবরের কাগজে রয়টারের টেলিগ্রাফে দেখলাম, ছ'দিন আগে ৭ই আগস্ট জার্মানিতে নিতুর মৃত্যু হয়েছে।" এতবড় দুঃসংবাদ কেমন করে কবিকে জানানো যায়? চিন্তায় পড়লেন শ্রীমতী মহলানবিশ। তখন রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী আছেন খড়দায়। তাঁদের ফোন করা হোলো। তাঁরা এলেন। পরের ঘটনা শ্রীমতী মহলানবিশের বর্ণনা থেকে বলি[১] রথীন্দ্রনাথকে কবি জিজ্ঞাসা করলেন— "নিতুর খবর পেয়েছিস, সে এখন ভালো আছে না?" রথীবাবু বললেন, না খবর ভালো না। কবি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, "ভালো? কাল এণ্ডরুজও লিখেছেন যে নিতু অনেকটা ভালো আছে। রথীবাবু এবারে চেষ্টা করে গলা চড়িয়ে বললেন, না খবর ভালো নয়। আজকের কাগজে বেরিয়েছে। কবি শুনেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে রথীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।" একটু পরেই শান্তভাবে সহজগলায় বললেন, "বৌমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান, সেখানে বুড়ি নন্দিতা নিতুর বোন—একা রয়েছে। আমি আজ না গিয়ে কাল যাবো। তুই (রথীন্দ্রনাথ) আমার সঙ্গে যাস্।" কবি তারপরই যে শান্তিনিকেতনে চলে যান সেটা শ্রীমতী মহলানবিশকে লেখা একখানা চিঠি থেকেই বুঝা যায়। ২১শে আগস্ট শান্তিনিকেতন

---

১ বাইশে শ্রাবণ পৃঃ ২৯

থেকে লিখছেন,[১] "মনের খুব গভীর তলায় একটা ব্যথা সর্বদাই রয়ে গেছে। অনিবার্য দুর্ঘটনার কাছে হাল ছেড়ে দিতে লজ্জা করে। বিশেষত যখন বাইরের লোক মনে করে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তাই জীবনযাত্রা আগেকার মতই সম্পূর্ণ সহজভাবেই চালিয়ে যাচ্চি।…আমি ওকে (নিতুকে) মনে মনে কতো যে ভাল বাসতুম তা অনেকেই জানে না—কিন্তু এখন সে কথা বলে কী হবে। আমিই তো ওকে নিজে চেষ্টা করে জার্মানিতে পাঠিয়েছিলুম। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল।……" এর পরের চিঠিতে লিখছেন,[২] "…এবারে সকলেই বর্ষামঙ্গল বন্ধ রাখবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত শোক দুঃখের উপলক্ষ্যে নিয়মের ওলটপালট করা আমাকে লজ্জা দেয়—যেটা অন্তরের ব্যাপার সেটা অন্তরে থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাকে আন্দোলিত করতে একেবারেই ভালো লাগে না।…"

ওদিকে মীরাদেবীরা ফিরে আসছেন। ২৮শে আগস্ট পুত্রহারা কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখছেন শান্তিনিকেতন থেকে[৩]— "……নীতুকে খুব ভালবাসতুম তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চল্‌চে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চল্‌ব। অনেকে বললে

১ পত্রসংখ্যা ২১৫, তা ২১শে আগস্ট, ১৯৩২

২ পত্রসংখ্যা ২১৬, তা ২৬শে আগস্ট, ১৯৩২

৩ চিঠিপত্র ৪র্থ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৬৬

এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্,—আমার শোকের খাতিরে—আমি বললুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব—বাইরের লোক কি বুঝবে তার ঠিক মানেটা। অন্তত তাদের এইটুকু বোঝা উচিত, বাইরে থেকে কোনো রকম সান্ত্বনার চিহ্ন, কোনো রকম আনুষ্ঠানিক শোক একটুও দরকার নেই; তাতে আমার অমর্যাদা হয়। ভয় হয়েছিল পাছে সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তাই কিছু দিনের জন্যে বারণ করেছিলুম সবাইকে আমার কাছে আসতে। কিন্তু আমার সকল কাজকর্মই আমি সহজভাবে করে গেছি, শোক দেখিয়ে কোন কিছুই বাদ দিতে চাই নি। ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্য সব কিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সব চেয়ে আত্মাবমাননা। অনেকদিন ধরে একান্তমনে কামনা করেছিলুম যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যদি আমার বিশেষ বন্ধু কেউ থাকেন তিনি আমাকে দয়া করুন। কিছু জানিনে, হয়ত দয়াই করেছেন, হয়ত আরো বেশি দুঃখের হাত থেকে রক্ষাই পেয়েছি। এমনতরো প্রার্থনা করাই দুর্বলতা। আমার জন্যে বিশ্বনিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হবে এমনতরো আশা করি যখন মন অত্যন্ত মূঢ় হয়ে পড়ে। কষ্ট যখন সকলকেই পেতে হয় তখন আমিই যে প্রশ্রয় পাব এত বড়ো দাবী করবার মধ্যে লজ্জা আছে। যে রাত্রে শমী চলে গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্বার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কামনা নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ

হোক। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না। কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।......" ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীমতী মহলানবিশকে লিখছেন,[১] "রানী, আর দু' তিন দিনের মধ্যে মীরু বোম্বাই পৌঁছবে। বর্ধমান হয়ে এখানে আসতে টেলিগ্রাম করেচি। আজকাল পরে পরে নীতুর খবর ক্রমশই পাচ্ছি। ব্যথার উপর বার বার ঘা পড়চে। ভয় হয় পাছে বাইরের লোকের কাছে সেটা প্রত্যক্ষ হয়। কাজ কর্ম করে যাচ্চি।

মীরা যখন এখানে আসবে তুমি যদি থাক খুশী হব। সে তোমাকে ভালোবাসে—তোমার কাছে মন খুলতে তার সঙ্কোচ হবে না, প্রথম আগমনের সময়টা বড়ো বিশ্রী, সকলের চোখে পড়তে নিশ্চয় তার খারাপ লাগবে, মানুষের দুঃখের জের শীঘ্র মিটতে চায় না। আমি যাব, বর্ধমান থেকে তাকে নিয়ে আসব।.........।" "আমি যাব, বর্ধমান থেকে তাকে নিয়ে আসব," এই কটা কথার মধ্যে কি বেদনা, কি ব্যাকুলতাই না প্রকাশ পেয়েছে।

---

১ পত্রসংখ্যা ২১৮, তা ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

প্রায় একবছর পর। নিতুর স্মৃতিবিজড়িত কিছু জিনিসপত্র কবির কাছে পৌঁছেচে। দুঃখ করে শ্রীমতী মহলানবিশকে লিখছেন,[১] "এতদিন পরে নিতুর কিছু জিনিসপত্র, কিছু লেখা ডায়েরী প্রভৃতি হাতে এসে পৌঁছেচে। মনকে প্রতিদিনের সংসার থেকে বহুদূরে নিয়ে গেছে। কতদিন ভেবেছি কর্মসংকুল সংসারের একপ্রান্তে একটুখানি জায়গা করে নেব যেখানে মৃত্যুর দরবার, যেখানে মৃত্যুর ভূমিকার উপরে জীবনটাকে শান্ত করে নিয়ে তার বিচার করতে পারব। অনেক ক্ষোভ, অনেক ক্রোধ, অনেক অন্যায় কেবলমাত্র জীবনকে মৃত্যুর অনুষঙ্গ থেকে দূরে দেখবার জন্যেই ঘটে—ছন্দ যায় ভেঙে।"

প্রমথ চৌধুরী মশায়কেও লিখছেন,[২] ·····কিছুকাল থেকে আমি আছি মৃত্যুর ছায়ায় ডুবে। নীতুর বই তার কাপড় তার জিনিসপত্র এসে পৌঁছেচে,······ওর একটি ডায়েরী পেয়েছি, অতি অল্পই লিখেছে, সেটুকু লেখার মধ্যে এমন একটি পরিচয় আছে তাতেও ওযে নেই সেটাকে একটা নিষ্ঠুর অন্যায় বলে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।" ১৯৩৫ সালের ২১শে জুলাই কবির গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যু হোল কলকাতায়। ১৯৩৭ সালের ২২শে নভেম্বর পরমসুহৃদ জগদীশচন্দ্র মারা গেলেন গিরিধিতে।

১৯৪০ সালের ৫ই এপ্রিল কলকাতায় নার্সিংহোমে মৃত্যু হোলো কবির স্নেহধন্য পরমভক্ত দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের। এ সম্পর্কে শ্রীমতী রানী চন্দ লিখছেন,"আজ (৫ই এপ্রিল, ১৯৪০) সকালে প্রায়অন্ধকার থাকতে খবর পাওয়া গেল—দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ আর এ পৃথিবীতে

১ পত্রসংখ্যা ২৪০, তা ১লা ভাদ্র, ১৩৪০

২ চিঠিপত্র ৫ম, পত্রসংখ্যা ১১, তা ১২ই আগস্ট, ১৯৩৩

নেই। ......চা খাওয়া হয়ে গেলে পর সেক্রেটারি তাঁকে এখবর দিলেন। গুরুদেব কোলের উপর হাত দুখানি রেখে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। পরে অতি ধীরে ধীরে বললেন, "এণ্ড্রুজ মারা গেছেন। অনেককালের বন্ধু ছিলেন। ......পেয়েছিলুম একটি, ওরকমটি আর পাব না। রইল না,......আমার জন্যে এণ্ড্রুজ প্রাণ দিতে পারত।......" বিকাল বেলা আশ্রমে সকলে একত্র হয়ে তাঁর আত্মার জন্যে শান্তি প্রার্থনা করলেন। বিশেষ অসুস্থতা সত্ত্বেও কবি সেই প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৪০ সালের ৩রা মে কলকাতায় মারা গেলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথকে কবি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। জমিদারীর কাজে ও ব্যবসায়ে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সঙ্গী। সুরেন্দ্রনাথ তখন রোগশয্যায়, কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন,[১] "এতদিন পরে সুরেনকে যদি হারাতেই হয় তাহলে আমার পক্ষে সান্ত্বনা এই থাকবে যে তার বিচ্ছেদ বেশি জায়গা পাবে না নিজেকে বিস্তীর্ণ করবার জন্যে।" পরের চিঠিতে লিখছেন,[২] "কাল সুরেনকে দেখে অবধি মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। কিছুই করবার নেই—ভালই হোক মন্দই হোক প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে। ৫০০৲ পাঠাচ্ছি—সুরেনের বইএর আগাম প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করিস্। "সুরেন্দ্রনাথের যখন মৃত্যু হয় কবি তখন মংপুতে। সুধাকান্ত বাবু ধীরে ধীরে সংবাদটি জানালেন। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন,[৩] "সবাই চলে গেলুম, স্তব্ধ হয়ে চোখ বুঁজে বসে রইলেন।

---

১ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬৩-৬৪

২ চিঠিপত্র ৫ম, চৈত্র, ১৩৪৬, পৃঃ ১২৫

৩ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২৭৩-৭৪

আড়াল থেকে দেখলুম চোখ বুজে আত্মসংবরণ করছেন। ...... সন্ধ্যেবেলা চুপ করে বসেছিলেন। ......একবার বল্লেন, কেউ জানলো না সে কি আশ্চর্য মানুষ ছিল! এমন মহৎ, এমন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ সকলের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, অগোচরেই চলে গেল, যারা জানে শুধু তারাই বুঝবে এমন হয় না, এমন দেখা যায় না।" শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন,[১] "তোরা বোধ হয় জানিস্ আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালবেসেছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার চেষ্টা করেছি বার বার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধহয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে আসছে।" শ্রীমতী মহলানবিশকে লিখছেন,[২] "সুরেনের মৃত্যুতে মনে খুব বেদনা পেয়েছি। এমন মানুষ দেখা যায় না। তবু আপনার স্মৃতিচিহ্ন মুছে নিয়েই চলে গেল।"

মহাপ্রয়াণের পূর্বে সর্বশেষ আঘাত—কবির কর্মযজ্ঞের অন্যতম হোতা কালিমোহন ঘোষের মৃত্যু।

---

১ চিঠিপত্র ৫ম, পৃঃ ১২৬

২ পত্রসংখ্যা ৪৭৯, তা ১৪. ৫. ৪০

রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষশাস্ত্র

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু প্রিয়নাথ সেন ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করতেন। রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী একবার তিনি নেন। সম্ভবতঃ বিচার করবার জন্যে। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একাধিক চিঠিতেই এর উল্লেখ আছে। লিখছেন,[১] "আমার কুষ্ঠিখানা এই লোকের হাতে একবার পাঠাতে পারেন ?" কিছুদিন পরে লেখা আর একখানা চিঠি,[২] "একজন গণক এসেচেন তাই বাড়ির লোকেরা আমার কুষ্ঠি দেখাতে চান—কুষ্ঠিটা এই লোকের হাতে এখনি পাঠিয়ে দিও।" এখানে 'বাড়ির লোক' বলতে সম্ভবতঃ স্ত্রীই। এ চিঠি লিখেও বোধহয় কুষ্ঠি পান নি তাই পরের চিঠিতে ফের লিখছেন,[৩] "তুমি ত আজ আসচ, অমনি এই লোকের হাতে আমার কুষ্ঠিটা পাঠিয়ে দিও। আমার একজন বন্ধু এসেচেন—তিনি দেখতে চাচ্চেন।" জ্যোতিষশাস্ত্রে বোধহয় কবির বিশ্বাস ছিল। এর পরের চিঠিতে লিখছেন,[৪] "সেই গণনার বইখানা পাঠিয়ে দিও।" কয়েক বছর পরে একখানা চিঠিতে বেশ জোর তাগিদ দিয়ে লিখছেন,[৫] "আমাদের কুষ্ঠিগুলা লইয়া করিতেছ কি ? এদিকে পরমায়ু যে অবসান হইতেছে।" এখানে লক্ষণীয় 'আমাদের' লিখছেন, 'আমার' নয়। অর্থাৎ নিজের কুষ্ঠির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের

---

১ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৩ (১৮৮৪ ?)

২ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৪৪-৫৮নং চিঠি

৩ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৪৪-৫৯নং চিঠি

৪ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৪৪-৬০নং চিঠি

৫ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৬০ (১৩ই মার্চ ? ১৯০১)

কুষ্ঠিও ছিল বলে মনে হয়। আর একখানা চিঠিতে একই সময় ঐ রকম তাগিদ,[১] "হাঁ আমাদের কোষ্ঠিগুলার কি করিতেছ? ছোটবৌ মাঝে মাঝে তাহার জন্য তাগিদ করেন। দৈবাৎ নষ্ট হইলে ছেলেদের জন্মপত্রিকা আর নাই। তুমি চক্রগুলা কপি করিয়া লইয়া কুষ্ঠিগুলা যদি রেজেষ্ট্রী ডাকে ফেরৎ পাঠাও তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। আমাকে বার বার তিনি স্মরণ করাইয়া দেন আমি বার বার ভুলি। সেদিন একজন দৈবজ্ঞ নলডাঙ্গা হইতে আসিয়াছিল তাহাকে ছেলেদের কুষ্ঠীগুলা দেখাইবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য হয় কিন্তু কুষ্ঠীগুলা না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।" এর প্রায় আড়াই বছর পরে একখানা চিঠিতে দেখি,[২] "আমার কুষ্ঠিটা একবার শৈলেশের কাছে দিয়ো—আমার প্রয়োজন আছে। সুসময় দুঃসময় জানবার জন্যে কোন কৌতূহল আর রাখিনে—যা ঘটে তা ঘটুক্—ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপনার কাজ করে যেতে চাই।" এই চিঠির ঠিক একবছর পূর্বে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে মধ্যমা কন্যা রেণুকা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। বিপদ যখন আসে মানুষ তার পূর্ববিশ্বাস অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। স্ত্রীর অকালমৃত্যু, কন্যার দুরারোগ্য ব্যাধি রবীন্দ্রনাথের মনেও হয়তো একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। অন্ততঃ এই চিঠিখানা থেকে সেই রকমই মনে হয়।

---

১ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২৩ (১৯০১?)
ছোটবৌ—শ্রীমৃণালিনী দেবী।

২ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২০৭ (৬ই অক্টোবর, ১৯০৩)
'কোষ্ঠী' শব্দের বানান রবীন্দ্রনাথ যেরকম লিখেছেন আমরা সেই রকমই তুলে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো পড়লে মনে হতে পারে প্রিয়নাথ বাবু কোষ্ঠীগুলো নিয়ে বুঝি ফেরৎ দিচ্ছেন না। তা নয়। তিনি কোষ্ঠী বিচার করতেন, মিলিয়ে দেখতেন। কোষ্ঠী নিশ্চয়ই তিনি ফেরৎ দিতেন, আবার নিতেন।

প্রিয়নাথ বাবু একবার রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী বিচার করে বাস্তবের সঙ্গে তার অত্যাশ্চর্য মিলের কথা একটি প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখছেন,[১] "প্রশ্ন উঠে কবি কি হাত দেখা, কোষ্ঠী করা প্রভৃতিতে বিশ্বাসবান্ ছিলেন? হয়তো ছিলেন—কারণ তিনি বলিতেন বিশ্বাস করা যেমন গোঁড়ামি, বিশ্বাস করিব না তাহাও আর এক শ্রেণীর গোঁড়ামি; মনকে খুলিয়া রাখো—পরীক্ষা করো—সত্যাসত্য নির্ণীত হইবে।"

১ রবীন্দ্রজীবনী ১ম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯৯

পরিহাসপ্রিয়তা

রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় রসস্রষ্টা। সেই রসসৃষ্টি শুধু যে তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। দৈনন্দিন গল্পে, আলাপে, সংলাপে, পরিচয়ে তিনি রসসৃষ্টি করতেন। কৌতুকে ও রসালাপে তিনি তুলনারহিত। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতেও তাঁর এই কৌতুকপ্রিয়তা বাধা পায় নি—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তার অব্যাহত প্রবাহ। কবির একান্ত স্নেহভাজন যাঁরা, যাঁরা সর্বদাই তাঁর কাছেপিঠে থাকতেন তাঁদের নিয়েই কবির রসালাপ জমতো।

শান্তিনিকেতনের অন্যতম কর্মী শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী। কবির বিশেষ প্রিয়পাত্র। সুধাকান্তের মাথায় ছিল টাক। কবি ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিলেন, বলডুইন। আবার কখনো কখনো ডাকতেন টাকশাল বলে। একদিন সুধাকান্তের মাথার টাক লক্ষ্য করে কবি বললেন, 'তোর শিরোদেশ যে ক্রমেই মেঘমুক্ত দিগন্তের আকার ধরছেরে।' সুধাকান্ত বললেন, 'আমার বাবারও ঐ রকম হয়েছিল শেষজীবনে।' কবি হেসে বললেন, 'তাতেই বুঝি শিরোধার্য করেছিস্ ওটা ?' আবার কখনো বলচেন, সুধা সমুদ্র, সুধাকান্তবাবু ভালো হিন্দী জানতেন এবং শান্তিনিকেতনের জন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাড়োয়ারি মহলে ঘুরাফিরা করতেন বলে কবি মাঝে মাঝে তাঁকে ডাকতেন 'সুধোড়িয়া' বলে।

শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী। তাঁর ডাকনাম ছিল 'আলু'। কবি ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে ডাকতেন, 'পট্যাটো' বলে।

শ্রীসুধীর করকে বলতেন, বাঙাল। তাঁর নামে কয়েকটা ছড়াও বানিয়েছিলেন—

সুধীর বাঙাল গেল কোথায়
সুধীর বাঙাল কৈ ?
সাতটা থেকে আমার মুখে
নেই কথা এই বৈ !

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশকে কখনো অধ্যাপক কখনো বৈজ্ঞানিক, কখনো স্ট্যাটিস্টিসিয়ান কখনো সাংখ্যিক বলে সম্বোধন করতেন।

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বলতেন হেডনার্স। আর একটি নামও দিয়েছিলেন, 'হয়-রানী'। শ্রীমতী মহলানবিশের ডাক নাম 'রানী'। স্বামী অধ্যাপক মহলানবিশ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী—মোটা টাকা মাইনে পান। সুতরাং তাঁর 'রানী' নাম সার্থক! কিন্তু শ্রীমতী রানী চন্দের নাম দিয়েছিলেন 'নয়-রানী'। অর্থাৎ তাঁর রানী নাম সার্থক নয়। কবি বলেছিলেন,[১] আর তোমার স্বামী কি, না, রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি, আরে, তুমি আবার 'রানী' কি? তুমি 'নয়-রানী।' শ্রীমতী চন্দকে 'দ্বিতীয়া' ও বলতেন।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে কখনো বলতেন, মাংপবী আবার কখনো মিত্রা, কখনো সুমিত্রা।

মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতা, ডাকনাম বুড়ী, কবি ডাকতেন বৃদ্ধা বলে আবার কখনো বলতেন, মেমসাব।

বনমালী, কবির ভৃত্য। উড়িষ্যায় বাড়ী। কুচকুচে কালো। কবি ডাকতেন নীলমণি বলে, কখনো বলতেন লীলমণি। তাকে নিয়ে কত কৌতুকই না করতেন। একদিন বনমালীকে বলেছেন তাড়াতাড়ি চা

১ গুরুদেব—রানীচন্দ, পৃঃ ১১০

আনতে, কিন্তু সে দেরী করেছে। সে এলে বললেন, 'তুই বোধ হয় জানিস না যে তোর অতুলনীয় অকর্মণ্যতায় আমি খুব বেশী পুলকিত হই নি?'

কবি রাত্রে ঘুমিয়ে আছেন। জানালা দিয়ে মুখের ওপর চাঁদের আলো পড়ছে। ঘুম ভেঙে গেল। ভৃত্য মহাদেবও একই ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছিল। কবি ডাকলেন মহাদেবকে। বললেন, 'চাঁদটাকে ঢেকে দে তো, ঘুম হচ্ছে না।' মহাদেব তো অবাক্। কেমন করে চাঁদ ঢাকবে! কবি হেসে বললেন, 'জানালাটা বন্ধ করে দে।'

কবি আছেন মংপুতে। ভৃত্য বনমালীও সেখানে। কবি জিজ্ঞাসা করলেন একদিন বনমালীকে,[১] "বনমালী খাওয়া দাওয়া চলছে কেমন?" "আজ্ঞে তা ভালই চলেছে, দিদিমণি (মৈত্রেয়ী দেবী) আবার আমায় দুধ খাওয়াচ্ছেন।" "দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন, তার চেয়ে দুধ মাখালে পারতেন, খেয়ে তো রংএর বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না।" বনমালীর গায়ের রং খুব কালো ছিল।

তাসের দেশের রিহার্সাল হচ্ছে। শ্রীঅনিল চন্দ 'মেঘ' শব্দটাকে ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারছেন না বলছেন 'ম্যাগ'। কবি বললেন, 'মেঘ' কথা তোর বলবার দরকার নেই, বলিস 'কুয়াশা'। একদিন চাএর টেবিলে বনমালী কেক এনে বললে, অমুকদিদি করে পাঠিয়েছেন, একটুখানি ক্যাক খান আপনি। টেবিলে শ্রীচন্দও উপস্থিত ছিলেন, কবি তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "ও আমার খেয়ে কাজ নেই বাপু যারা 'ম্যাগ' বলে তাদের 'ক্যাক্' খাওয়াও তো।"[২]

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৮

২ গুরুদেব—রানীচন্দ, পৃঃ ৬১

কবি ট্রেনে চলেছেন ভিজানা গ্রাম, আপন মনে বিড় বিড় করে বলছেন, সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত। শ্রীমতী রানীচন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, সে আবার কি? কবি বললেন, শুনতে পাচ্ছিস নে? গাড়ির চাকায় শব্দ উঠছে—সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত—সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত—সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত।[১]

একদিন একজন এলেন কবিকে গান শোনাতে। তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা সুস্থ ছিল না। গান হোলো। ধৈর্যের সঙ্গে কবি গান শুনলেন। গায়ক চলে গেলে বললেন, "গান বটে, একেবারে মেসিন গান।"

একটা পত্রিকার কথা হচ্ছিল। কবি বললেন, 'একদা সম্পাদক ছিলাম আমি এই পত্রের।' কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক কি এই পত্রের সহসম্পাদক ছিলেন?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন কবি, 'সহ কি দুঃসহ বলতে পারি না, তবে ছিলেন মনে হচ্ছে।'[২]

এবার মহাত্মাজী কবিকে বললেন, 'গুরুদেব, একটা ভিক্ষে দিতে হবে। দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুমুবেন।' কবি বললেন, 'ঘুমুই নি যে দুপুরে কখনো।' মহাত্মাজী তবুও বললেন, 'না ঘুমোন, একটু শুয়ে বিশ্রাম নেবেন।' এর কয়েকদিন পরে দুপুরে আচার্য ক্ষিতিমোহন কবির ঘরে ঢুকে দেখেন কবি ঘুমুচ্ছেন। ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় কবি বলে উঠলেন, 'ঘুমুই নি আমি।' 'তবে'? 'মহাত্মাজীকে ভিক্ষে দিচ্ছিলাম।'

কবি চলেছেন দাক্ষিণাত্যে। মাদ্রাজ থেকে কুন্নুরের স্টেশনে,

১ গুরুদেব—রানীচন্দ, পৃঃ ৩৮

২ কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬৭-৬৮

স্টেশনে অসম্ভব ভিড়। কবি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এণ্ড্রুজ সাহেবকে বললেন, 'তুমি আমার হয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলো, তাদের উপহার নাও, তাদের বুঝিয়ে বলো, আমি ক্লান্ত।' ভোরবেলা একটা স্টেশনে সাহেব একরাশ মালা ইত্যাদি নিয়ে কবির কামরায় এসে হাজির। সাহেব বললেন, 'দেখো গুরুদেব, তোমার হয়ে আমাকে কতোমালা পরতে হয়েছে।' কবি হেসে বললেন, "মালা যারা পরিয়েছিল তাদের মধ্যে কোনো মেয়ে ছিল না তো?" এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন চিরকুমার। সাহেব হাসতে লাগলেন।

বনমালীর সঙ্গে পরিহাসটাই জমত ভালো, বনমালী ছিল একটু সরলপ্রকৃতির। সে ন্যাপকিনকে বলতো 'লাপকিন', লম্বাকে বলতো 'নাম্বা', স্যানাটোজেনকে বলতো 'স্যানাডডন'। কবি একদিন বনমালীকে বললেন, "যাবার আগে 'লাপকিন'টা দিয়ে যাও। 'লাপকিন'টা দিয়ে 'নাম্বা' টেবিলটা এদিকে সরিয়ে দাও। তারপর 'স্যানাডডনে'র শিশিটা রাখ তার উপরে।[১]

এই রকম হাস্য-পরিহাসের বিরাম ছিল না।

---

১ গুরুদেব—রানা চন্দ, পৃঃ ৩৬

খেয়াল খুশির টুকিটাকি

রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রধান খেয়াল বা সখ ছিল—এক ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা করা—দ্বিতীয় বাসা বদলানো। কবি এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারতেন না। হাঁপিয়ে উঠতেন। তৈরী হোলো একটা নতুন বাড়ী। গেলেন সেখানে। বললেন, বাঃ ঠিক হয়েছে এইবার। এই রকমটিই তো চাইছিলাম। কিছুদিন গেল। বললেন, না, ভাল লাগছে না। আবার গেলেন আর একটায়। এই ভাবে শান্তিনিকেতনে অনেক বাড়ি তৈরী হয়। যেমন—কোনার্ক, মৃন্ময়ী, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী। বাড়ী এমনভাবে হওয়া চাই, যার চারদিক হবে খোলা। ঘরে বসে কবি দেখবেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। যেমন বাড়ী বদলানো তেমনি ঘর বদলানোও ছিল আর একটা শখ। হয়তো শোবার ঘরটাকে করলেন বসবার ঘর, বসবার ঘরকে শোবার ঘর। লিখবার ঘরকে রান্নাঘর, রান্নাঘরকে লিখবার ঘর। এই রকম খেয়াল তার চলতোই। বৈচিত্র্যপ্রিয় কবি নতুনত্বের আস্বাদ চাইতেন। বৈচিত্র্যই ছিল তাঁর কাছে জীবন, বৈচিত্র্যহীনতাই মৃত্যু। শৌখিন আসবাবপত্র কবির পছন্দ ছিল না। লিখবার টেবিলের হয়তো একটা পায়া নেই। ক্ষতি কি? বরং সুবিধে। যতটা ইচ্ছে কোলের কাছে টেনে এনে লেখো। খেয়াল হোলো—না, ওসব নয়। সব সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী করো। সরানো ঘুরানোর হাঙ্গামা নেই। বেশ হবে। শোবার খাট, টেবিল, চেয়ার, শেলফ সব-কিছু তৈরী হোলো সিমেণ্ট দিয়ে। কবি খুব খুশি। কিছুদিন গেল। বললেন, এতে বড়ো অসুবিধে। ইচ্ছামতো সরানো ঘুরানো যায় না। ভেঙ্গে ফেলো সব।

খেয়াল হোলো—ওরকম বিছানা চলবে না। লেপ, তোষক, বালিশ সরিয়ে ফেলো। কেবল কম্বল দিয়ে বিছানা হবে। কম্বল পাতা হোলো, কম্বলের বালিশ হোলো, গায়েও কম্বল। অবশ্য এ ব্যবস্থাও স্থায়ী হয় নি। একবার জোড়াসাঁকোতেও এই রকম কম্বল নিয়ে পরীক্ষা চলেছিল। এ সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীসুধীর কর[১]—অভিনয়ে গিয়েছেন কলকাতায়। কি মনে হল বলে বসলেন, সাদাসিধে ভাবে থাকবেন। কম্বল হবে শয্যা সম্বল। সঙ্গে সঙ্গে কম্বল ওয়ালার আমদানি হতে লাগল দলে দলে। মোটা খসখসে দিশি কম্বল। গদি উঠিয়ে পঁচিশ-ত্রিশ খানা কম্বল পাতা হল, তৈরী হল বিছানা। শুধু কি তাই, মেজেয় কম্বল, জানালায় কম্বল। কম্বলে জোড়াসাঁকোর ঘর ভরা। এদিকে কদিন পরেই শুরু হয়ে গেল ছটফটানি।— খেয়ে ফেল্লেরে ছারপোকা। ঝাড় বিছানাপত্তর, রোদে দে, ধুয়ে দে গরম জলে, মেরে ফেল্, শিগ্গির মেরে ফেল্ ঐ আপদগুলোকে ইত্যাদি। করা হল সবই। কোথায় ছারপোকা! আসল কথা কম্বলের কুটকুটে রোঁয়া-ফোটার জ্বালা। গা উঠল চুলকুনিতে ফুলে। তাঁর ধারণা—এ ছারপোকারই খোঁচা। চাকরের দল রোজ সেই পঁচিশ-ত্রিশখানা কম্বল রোদে দিতে লাগল, তবু অসোয়াস্তির শেষ নেই। তখন হল মশার দোষ। এল ফ্লীট, ঘর-দোরে তো দেওয়া হলই, বললেও অবিশ্বাস জাগবে—সোফায় তিনি বসে থাকতেন চোখ বুজে,—আর তাঁর চাকররা তাঁরই হুকুমে দরজা-জানালা সব এঁটে ঘর অন্ধকার করে নিয়ে মশা-মাছির লোপের জন্য তাঁর অমন গায়ে অবধি ছড়িয়ে

---

১ কবিকথা, পৃঃ ২৭

দিত সেই অপূর্ব জিনিসটি। পিচ্‌কারী ভরে ভরে প্রায় জব্‌জবে করে ভিজিয়ে তুলত জোব্বাগুলি।"

'শ্যামলী' মাটির বাড়ী। মাটির দেওয়াল, মাটির ছাদ। এর পিছনে নাকি একটু ইতিহাস আছে। চাল যদি খড়ের হয় তো আগুন লাগবার সম্ভাবনা বেশী। আর ছাদ যদি মাটির হয় তো আগুনের ভয় থাকে না। সুতরাং এই রকম একটা শুধু মাটির বাড়ি যদি তৈরী করা যায় তাহলে তাই দেখে গরীব দুঃখী লোক-গুলো ঐ রকম বাড়ী করবে—তাতে খরচও কম হবে আগুনের ভয়ও থাকবে না।

গান্ধীজী এলেন। কবি তাঁকে থাকতে দিলেন শ্যামলীতে। বললেন, এ বাড়ী আপনাকে দিলাম। যখন খুশী আসবেন, থাকবেন এখানে। গান্ধীজী সে অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

আর একটা অদ্ভুত খেয়াল ছিল কবির। হয়তো কোথায়ও যাবেন, কালিম্পং কি মংপু বা আর কোথায়ও। সব ঠিক। শেষ মুহূর্তে যাওয়া হোলো না। কতবার দিন বদলাতেন তার ঠিক নেই, একবার শান্তিনিকেতনে বর্ষা নামলো না। ভয়ানক গরম। কবির কষ্ট হচ্ছে। স্থির হোলো কালিম্পং যাবেন। ক'দিন ধরে তোড়জোড় চললো। যাওয়ার দিন লোকজন, জিনিসপত্তর স্টেশনে পৌঁছলো। কবি মোটরে গেলেন। ট্রেন এল। জিনিসপত্তর উঠলো। এইবার কবি উঠবেন, ইতিমধ্যে মোটরে বসেই দেখেন এক টুকরো কালো মেঘ। ড্রাইভারকে বললেন, ফিরাও মোটর, চলো শান্তিনিকেতন। ভাবলেন বর্ষা বুঝি নামলো। কালিম্পং গিয়ে কি হবে। কিন্তু মেঘ গেল উড়ে। বর্ষা দেখা দিল না। কয়েকদিন পরে যেতেই হোলো। এই সব ব্যাপারে কবি হেসে

বলতেন, 'আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি'। শুনা যায় দ্বারকা-নাথের মতেরও এই রকম পরিবর্তন ঘটতো এবং তাঁর কর্মচারীরা বলতো—"Babu changes his mind every minute." বাড়ীতে ছিল একটা পোষা বেজী। একটা ময়ূর। আর সকালে কবি যখন চা খেতেন সেই সময় এসে জুটতো একটা দেশী কুকুর। বেজীর পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। ময়ূরকে সকলেই ভয় করতো। কে জানে কাকে কখন আঁচড়ে কামড়ে দেয়। সে কিন্তু এসে কবির কাছে চুপটি করে থাকতো। কবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। কুকুরটা ছিল লাল রঙের। তাই বোধহয় নাম তার লালু। সে এসে কবির কাছে বসতো। কবি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন। পাঁউরুটিতে পুরু করে মাখন মাখিয়ে খেতে দিতেন। মাখন দেওয়া না থাকলে লালু রুটি খেত না। মাখন দেওয়া হয়নি বলে বনমালীকে বকতেন। বলতেন,[১] এর কি ডিগনিটি দেখেছিস্? এমন ভদ্র কুকুর দেখা যায় না বড়ো।

নৌকায় নিরিবিলিতে থাকতে কবি খুব ভালবাসতেন। যখন জমিদারী দেখাশুনা করতেন তখন পদ্মায় বজরাতেই বেশী থাকতেন। কবি নিজেকে বলতেন, 'গাঙ্গেয়'। কারণ পদ্মার কোলেই তো তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। আর পদ্মাই তো হোলো গঙ্গা। কয়েকখানা বজরা ছিল—পদ্মা, চিত্রা, আত্রাই, নাগর। রবীন্দ্রনাথ ভাল সাঁতার দিতে পারতেন। বজরায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন। মাঝিরা তৎপর হয়ে থাকতো। মাঝিদের মধ্যে ফুলচাঁদ, রামগতি, তপসী মাঝির নাম অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

---

১ গুরুদেব—রানী চন্দ, পৃঃ ১০০

প্রত্যেক দিন অসংখ্য চিঠিপত্র আসতো। সবই তিনি নিজে খুলতেন পড়তেন, নিজের হাতেই জবাব দিতেন—যতদিন পেরেছেন অপরের সাহায্য নেন নি। তাঁকে চিঠি লিখে উত্তর পান নি এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না—তা সে যেমন চিঠিই হোক না কেন।

কবি বেশী লিখতেন পেলিকান কলমে আর কাজল কালিতে।

ছবি আঁকতেন তুলি দিয়ে, বেশীর ভাগই কলম দিয়ে। ইচ্ছামত রঙ নিজেই তৈরী করে নিতেন। আঁকার ব্যাপারে শিল্পীদের রীতি বড়ো অনুসরণ করতেন না।

এ টা—ও টা

"রবীন্দ্রনাথ যৌবনে খুবই শক্তিমান ছিলেন; পদ্মায় সাঁতার দিতে বা দীর্ঘসময় নৌকা বাহিতে তাঁহার সমপর্যায়ের কোনো ব্যক্তি ছিলেন না।"[১]

* * *

বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে সোলাপুর থেকে লিখছেন, "সম্প্রতি একদা সন্ধেবেলায় এখানকার ইংরেজমণ্ডলীর সঙ্গে খেলবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে বসে আছি।"[২]

'ইংরেজমণ্ডলী'র সঙ্গে কি খেলায় যোগ দিয়েছিলেন?

* * *

রবীন্দ্রনাথ হাইকোর্টের জুরার ছিলেন। প্রিয়নাথ বাবুকে লিখছেন, "জুরীর আহ্বানে আমাকে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে কলকাতায় ছুটতে হবে......" এর পরের চিঠিতে লিখছেন, "আমি জুরিতে আবদ্ধ হয়ে অস্থির ভাবে আছি।"[৩]

* * *

"Life Policy নিতে রাজি আছি—কত টাকার নেওয়া আবশ্যক এবং তার ব্যয় কি রকম একটু আভাস দিয়ো। বয়স, ৪১-এ পড়ব।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ কি জীবনবীমার কথা বলছেন?

* * *

---

১ রবীন্দ্রজীবনী ১ম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯৯

২ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৫১ (১৮৯৯)

৩ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৮৪, ৮৫ (১৮৯৯)

৪ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৭৪ (১৯০১)

"সেদিন প্ল্যাঞ্চেটে হাত দেবা মাত্র লেখা বেরল, 'বাবা মশায়ের অসুখ।' জিজ্ঞাসা করলুম আলমোড়া থেকে আমাকে কোথায় গিয়ে স্থিতি করতে হবে—বল্লে কলকাতায়।"[১]

* * *

"বড়ো বয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম।"[২]

---

১ চিঠিপত্র ৮, রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২০৫ (১৯০৩)

২ ছেলেবেলা—রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭৬

শেষ অধ্যায়

অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লম্বা, চওড়া, বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে কবি কালিম্পঙে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। দার্জিলিং থেকে সাহেব ডাক্তার এলেন দেখতে। কবির চেহারা দেখে সাহেব বলেছিলেন, 'What a body Dr. Tagore has!' কবির বয়স তখন ৭৯, রবীন্দ্রনাথ অসুখে বড় ভোগেন নি। ১৯১৩ সালে লণ্ডনের এক হাসপাতালে তাঁর অর্শ অস্ত্রোপচার হয়। এর পর ১৯৩৭ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর উত্তরায়ণে সন্ধ্যার সময় কবি অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এইটাই তাঁর জীবনের প্রথম বড় অসুখ বলা যেতে পারে। দুদিন হতচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। কলকাতা থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার আসেন। তাঁর চিকিৎসায় কবি সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাস খানেক পরে চিকিৎসার জন্যে তিনি কলকাতায় আসেন এবং অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের বেলঘরিয়ার বাড়ীতে কিছুদিন থাকেন। মহাত্মাজী তখন কলকাতায়। কবিকে দেখবার জন্যে যখন মোটরে উঠতে যাবেন সেই সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। কবি সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র মহাত্মার কাছে উপস্থিত হন।

এই ধাক্কা কবি আর সামলাতে পারলেন না। ধীরে ধীরে তাঁর শরীর ভাঙনের দিকে চললো। ১৯৪০ সাল। কবি আছেন কালিম্পঙে। ২৬শে সেপ্টেম্বর দুপুর বেলা কবি গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়েন। কীডনির অসুখ য়ুরিমিয়া। সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে সকলে ছুটে এলেন—সঙ্গে তিনজন বিখ্যাত ডাক্তার। কবিকে নিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে।

দুমাস থাকলেন এখানে। তারপর গেলেন শান্তিনিকেতন। রোজই জ্বর হয়। কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হোলো। কিন্তু য়্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের মতে অপারেশন করাই স্থির হোলো। কবির কিন্তু অপারেশনে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। ২৫শে জুলাই (১৯৪১) কবি তাঁর বড়ো সাধের শান্তিনিকেতন ছেড়ে চললেন কলকাতায়—শেষযাত্রা। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা গাইলো—"আমাদের শান্তিনিকেতন, সব হতে আপন।" এলেন জোড়াসাঁকোর পুরানো বাড়ীতে। উঠলেন তাঁর "পাথরের ঘরে"—পূর্বে কবি এই ঘরটিকে বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। ৩০শে জুলাই, অপারেশন হবে। সকাল বেলা কবি তাঁর শেষ কবিতা রচনা করলেন। লিখে নিলেন শ্রীমতী রানী চন্দ,

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।"[১]

এইটাই কবির শেষ রচনা।

বেলা ১১-২০ মিঃ এ অপারেশন আরম্ভ হয়। অপারেশন করেন তৎকালীন প্রখ্যাত সার্জেন ডাঃ ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিকে অজ্ঞান করা হয় নি। লোকাল এ্যানেসথিসিয়া দিয়ে অপারেশন করা হয়। কবি খুব ব্যথা পেয়েছিলেন—কিন্তু প্রকাশ করেন নি। অপারেশন হয় পাথরের ঘরের পূর্ব দিকের বারান্দায়।

যাকে বলে 'operation successful' তাই। কবি যেন কিছু উপশম পেলেন বলে মনে হোলো। কিন্তু সেটা সাময়িক, আবার দেখা দিল crisis. জীবন-মরণের সঙ্গে লড়াই চললো সাতদিন। ৭ই আগস্ট, ১৯৪১। বাংলা ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বৃহস্পতিবার,

১ শেষলেখা—১৫ নং কবিতা

রাখীপূর্ণিমা, বেলা ১২-১০ মিঃ মহাকবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বয়স ৮০ বৎসর ৩ মাস।

মহাকবি চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে।

"সেবিকারা তাঁর পবিত্র দেহ সাজিয়ে দিল শুভ্র উত্তরীয়ে। ললাটে আঁকা হোল শ্বেতচন্দনের তিলক, গলায় রজনীগন্ধার গড়ে।"[১]

"সাদা বেনারসীর জোড়, কপালে চন্দন। আজানুলম্বিত চাদর-খানা পাট করে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, গড়ে মালার ফুলের গন্ধে ঘর আমোদিত। শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ।"[২]

"গুরুদেবকে সাদা বেনারসী জোড় পরিয়ে সাজানো হল। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, পাটকরা চাদর গলার নীচ থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো, কপালে চন্দন, গলায় গড়ের মালা, দুপাশে রাশি রাশি শ্বেত কমল রজনীগন্ধা। বুকের উপরে রাখা হাতের মাঝে একটি পদ্মকোরক ধরিয়ে দিলাম, দেখে মনে হতে লাগল যেন রাজবেশে রাজা ঘুমচ্ছেন রাজশয্যার উপরে।"[৩]

শেষযাত্রা আরম্ভ হোলো বেলা ৩টায়।

কবির ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলায় যেন তাঁর শেষকৃত্য সমাপ্ত হয়। শ্রীমতী মহলানবিশকে তিনি বলেছিলেন,[৪] "তুমি যদি আমার সত্যি বন্ধু হও, তাহলে দেখো আমার যেন কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে, 'জয় বিশ্বকবি কি জয়, জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, বন্দে মাতরম্,—এই রকম জয়ধ্বনির মধ্যে সমাপ্তি

১ নির্বাণ, প্রতিমা দেবী, পৃঃ ৪৬

২ বাইশে শ্রাবণ, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, পৃঃ ২৪৮

৩ গুরুদেব, রানীচন্দ, পৃঃ ১৬৫

৪ বাইশে শ্রাবণ, পৃঃ ২৪৮-৪৯

না ঘটে। আমি যেতে চাই শান্তিনিকেতনের উদার মাঠের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের তলায়। আমার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে। সেখানে জয়ধ্বনি থাকবে না, উন্মত্ততা থাকবে না। থাকবে শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতির সমাবেশ। প্রকৃতিতে মানুষে মিলে দেবে আমাকে শান্তির পাথেয়। আমার দেহ শান্তিনিকেতনের মাটিতে মিশে যাবে—এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"

শ্রীমতী রানী চন্দের কাছেও কবি এই রকম ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন,[১] "...এখন চাই যেন ঘুমিয়ে পড়ি। আর না উঠি।......তার পরে তাই নিয়ে যেন একটা হৈ হৈ ধূমধাম ব্যাপার না করে। আমার ইচ্ছে, ছাতিমতলায় আমার বড়দার যেমন হয়েছিল, তেমনি—। চুপে চাপে শান্তভাবে যেন সব কাজ সারা হয়...... ।"

কিন্তু দুঃখের কথা কবির এই ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভবপর হয় নি। নিমতলা শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাপ্ত হয়, এবং শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলায় তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

১ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—পৃঃ ২২

পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা	নাম	পরিচয়
১	শ্যামের গণ্ডি	রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে লিখছেন, "আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম, শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি, সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ,...... গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এই জন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।"
২	আবদুল মাঝি	নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা জেলায় পদ্মার উভয় পার্শ্বেই ঠাকুরবাবুদের জমিদারী ছিল। পদ্মায় যাতায়াতের জন্য একাধিক বোটও ছিল। আবদুল এই বোটেরই একজন মাঝি বলেই মনে হয়।
২	সত্যপ্রসাদ	ভাগিনেয়। মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর পুত্র।
২	মাধব মুখোপাধ্যায়	(মাধব পণ্ডিত) গৃহ শিক্ষক।
৩	গৌরমোহন আঢ্য	ওরিয়েন্টাল সেমিনারী নামিত স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।

পৃষ্ঠা	নাম	পরিচয়
৪	সত্যেন্দ্রনাথ	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মেজ দাদা।
৪	ইন্দিরাদেবী	ভ্রাতুষ্পুত্রী। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা।
৫	জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোঃ	দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের কন্যা কাদম্বিনী দেবীর পুত্র। সম্পর্কে ভাগিনেয়।
৫	বিষ্ণু চক্রবর্তী	বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী গানের শিক্ষক।
৬	অচিন্ত্যকুমার	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক।
৬	প্রমথনাথ বিশী	শান্তিনিকেতনের ছাত্র। অধ্যাপক এবং প্রথিতযশা সাহিত্যিক।
৭	সীতাদেবী	স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।
৭	মৈত্রেয়ী দেবী	দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা। মংপুর সরকারী সিনকোনা বিভাগের ডাঃ মনোমোহন সেনের স্ত্রী। কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মৈত্রেয়ী দেবী 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ও 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থ দু'খানি রচনা করিয়াছেন।
৮	নন্দগোপাল বাবু	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক, সাংবাদিক। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য।
৯	সজনীকান্ত দাস	সাহিত্যিক, সাংবাদিক। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক।
৯	বুদ্ধদেব বসু	সাহিত্যিক, অধ্যাপক।
৯	দীনেশ সেন	শিক্ষাবিদ্, সাহিত্যিক, গবেষক।

পৃষ্ঠা	নাম	পরিচয়
১০	রামেন্দ্রসুন্দর	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্, বিজ্ঞানী, লেখক ও অধ্যাপক।
১০	বলেন্দ্রনাথ	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র। সুলেখক এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র।
১১	নবীন সেন	কবি নবীনচন্দ্র সেন।
১১	দিলীপকুমার	শ্রীদিলীপকুমার রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। কবি ও গায়ক।
১১	শ্রীকাননবিহারী মুখোঃ	কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন।
১৫	অমল হোম	সাংবাদিক। কবির স্নেহের পাত্র।
১৫	শরৎচন্দ্র	অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৭	শ্রীসুধীর কর	শান্তিনিকেতনের কর্মী। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র।
১৮	রানীচন্দ	শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। শিল্পী মুকুল দের ভগ্নী। শ্রীঅনিলকুমার চন্দের স্ত্রী। কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী।
২৩	মৃণালিনী দেবী	কবির স্ত্রী।
২৩	ফটিক	কবি যখন পদ্মায় নৌকায় থাকতেন ফটিক সম্ভবতঃ সেই সময়কার পাচক ছিল।
২৪	প্রতিমাদেবী	কবির পুত্রবধূ। রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী।
২৪	হেমন্তবালা দেবী	ময়মনসিং জেলার গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা। কবির বিশেষ অনুরক্ত।

পৃষ্ঠা	নাম	পরিচয়
২৬	সুধাকান্ত	সুধাকান্ত রায় চৌধুরী—শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও কর্মী। কবি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।
২৬	রথী	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির জ্যেষ্ঠপুত্র।
৩০	নির্মলকুমারী মহলানবিশ	অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী। কবির স্নেহধন্যা।
৩৩	প্রশান্ত মহলানবিশ	বিজ্ঞানী, অধ্যাপক। কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র।
৩৫	মীরা	মীরা দেবী। কবির কনিষ্ঠা কন্যা।
৩৭	বিধুভূষণ সেনগুপ্ত	সাংবাদিক।
৩৮	লেডি অবলা বসু	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী।
৩৮	রেণুকা	কবির মধ্যমা কন্যা।
৪৪	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	'রবীন্দ্রকথা' নামে রবীন্দ্রজীবনী রচয়িতা।
৪৫	পশুপতি ভট্টাচার্য	বিখ্যাত চিকিৎসক ও লেখক।
৪৫	শ্রীশচন্দ্র বাবু	সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কবির বিশেষ বন্ধু।
৪৬	জ্যোৎস্নাদেবী	শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের তৃতীয়া কন্যা।
৪৬	নেপাল রায়	নেপালচন্দ্র রায় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক এবং নানা দিক থেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।
৪৬	কমলা দেবী	নেপালচন্দ্র রায়ের পুত্রবধূ।
৪৭	মুকুল দে	প্রখ্যাত শিল্পী।
৪৭	বীণা	মুকুল দের স্ত্রী।
৫৪	জসীমউদ্দীন	কবি।

পৃষ্ঠা	নাম	পরিচয়
৫৬	বনমালী	কবির হিন্দুস্তানী পুরাতন ভৃত্য।
৫৮	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	সাহিত্যিক।
৬০	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	অবসর প্রাপ্ত আই. সি. এস্., সাহিত্যিক।
৬১	মহাদেব	কবির উৎকলবাসী ভৃত্য।
৬৫	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোঃ	শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক।
৬৯	জীবন রায়	জীবনময় রায়, চিকিৎসক।
৭৫	বুড়ী	মীরাদেবীর কন্যা কবির দৌহিত্রী, ভাল নাম নন্দিতা।
৭৬	অভিজিত	শ্রীঅনিলকুমার চন্দের পুত্র।
৭৯	শ্রীপরিমল গোস্বামী	সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
৮১	অনিল	শ্রীঅনিলকুমার চন্দ, কিছুদিন কবির সেক্রেটারী ছিলেন। বর্তমানে ভারত সরকারের মন্ত্রী।
৮২	বেলা	মাধুরীলতা, জ্যেষ্ঠা কন্যা।
৮৩	নিতু	নীতীন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর পুত্র।
৮৪	কৃষ্ণ	শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নন্দিতার স্বামী।
৮৪	জ্যোৎস্না	শান্তিনিকেতনের ছাত্রী।
৮৪	সুনীত	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা।
৮৮	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র।
৮৯	সুরেন্দ্রনাথ	দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র।
৮৯	বীরেন্দ্রনাথ	দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র।
৯০	প্রিয়নাথ সেন	কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু।
৯২	দ্বিপু	দ্বিপেন্দ্রনাথ—দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র।

পৃষ্ঠা	নাম	পরিচয়
১০২	বটু চাটুয্যে	জমিদারির কর্মচারী।
১০৪	তারকনাথ পালিত	মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু, ব্যারিস্টার।
১০৪	লোকেন্দ্রনাথ	লোকেন্দ্রাথ পালিত, তারকনাথের পুত্র, আই. সি. এস., কবির বন্ধু।
১০৬	যজ্ঞেশ্বর	কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ের একজন কর্মচারী।
১১০	শরতের	শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠ জামাতা, বেলা-দেবীর স্বামী।
১১২	দীনেন্দ্রকুমার রায়	সাহিত্যিক।
১২৫	সতীশ ঘোষ	জমিদারীর কর্মচারী।
১২৬	চন্দ্রময় বাবু	জমিদারীর পেশকার।
১২৭	জানকী রায়	জমিদারীর ম্যানেজার।
১২৮	প্রমথ চৌধুরী	মেজদাদা—সত্যেন্দ্রনাথের জামাতা, ব্যারিস্টার, সাহিত্যিক।
১৩৩	কাদম্বরী দেবী	পঞ্চম ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী।
১৩৫	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক, সাহিত্যিক।
১৩৫	ক্ষিতিমোহন সেন	আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, প্রখ্যাত পণ্ডিত, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক।
১৩৭	ভূপেন্দ্র সান্যাল	শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক।
১৩৭	শ্রীশ বাবু	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, অন্তরঙ্গ বন্ধু।
১৩৮	ভোলা	শ্রীশচন্দ্রের পুত্র।
১৪০	দিনু	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র।
১৪০	সত্য	সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মধ্যম জামাতা।
১৪১	পিয়ার্সন	শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক।
১৪১	সুধীন্দ্রনাথ	বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র।

পৃষ্ঠা	নাম	পরিচয়
১৪৩	এণ্ডরুজ	অধ্যাপক, ভারতপ্রেমিক, রবীন্দ্র-ভক্ত, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ নামে সমধিক পরিচিত।
১৪৫	শমী	কবির কনিষ্ঠ পুত্র।
১৪৭	জগদীশচন্দ্র	বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।
১৪৯	কালীমোহন ঘোষ	পল্লীসংঘঠন কার্যে কবির সহায়ক।
১৫৩	সচ্চিদানন্দ রায়	শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও আশ্রমের কর্মী।

রবীন্দ্রনাথের সন্তানাদি

রবীন্দ্রনাথ—জন্ম ২৫শে বৈশাখ, ত্রয়োদশী কৃষ্ণপক্ষ, সোমবার, রাত্রি ৪-১ মিনিট ১২৮৬ সাল, ১৭৮৩ শক। ইংরাজী মতে ৭ই মে, মঙ্গলবার, ১৮৬১ অব্দ।

মাধুরীলতা বা বেলা, জন্ম ১৮৮৬। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হয়, নিঃসন্তান। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর ১৯১৮ সালে মৃত্যু হয়।

রথীন্দ্রনাথ, জন্ম ১৮৮৮। গগনেন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবীর বালবিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সহিত বিবাহ হয়। পিতার নাম শেষেন্দ্র-ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, নিঃসন্তান। একটি মাতৃহীনা গুজরাটি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পালন করেন। নাম নন্দিনী। ডাকনাম পুপে বা পুয়ু। পিতার নাম চতুর্ভুজ। কচ্ছদেশীয় ব্রাহ্মণ। বিবাহ হইয়াছে বোম্বাইয়ের অজিৎ সিং মোরারজী খাটাও-এর সঙ্গে। রথীন্দ্রনাথের মৃত্যু ১৯৬১।

রেণুকা বা রানী, জন্ম ১৮৯০। বিবাহ হয় সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত। ডাক্তার। রেণুকার মৃত্যু হয় যক্ষ্মারোগে ১৯০৩ সালে। নিঃসন্তান।

মীরা বা অতসী, জন্ম ১৮৯৩। বিবাহ হয় নগেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়ের সহিত। পুত্র নীতীন্দ্র জার্মানীতে মারা যায় ২০ বৎসর বয়সে। কন্যা নন্দিতা, বিবাহ হয় গুজরাটের অধ্যাপক-ব্যারিস্টার শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর সঙ্গে।

শমীন্দ্রনাথ, জন্ম ১৮৯৬। ১৯০৭ সালে মুঙ্গেরে কলেরায় মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্র-জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা*

জন্ম : ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮, সোমবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, মধ্যরাত্রির পর (আড়াইটে থেকে তিনটে মতান্তরে রাত্রি ৪-১ মিঃ) ইংরাজী ৭ই মে, ১৮৬১ অব্দ, মঙ্গলবার (মধ্যরাত্রির পর জন্ম, সুতরাং মঙ্গলবার)।

পাঁচ বৎসর বয়সে হাতেখড়ি (১৮৬৬)

সাত বৎসর বয়সে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে, পরে নর্মাল স্কুলে প্রবেশ। (১৮৬৮)

আট বৎসর বয়সে কবিতা লেখার সূত্রপাত (১৮৬৯)

দশ বৎসর বয়সে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি নামে ফিরিঙ্গি স্কুলে প্রবেশ। (১৮৭১)

বয়স বারো (১১ বৎসর ৯ মাস) বৎসর বয়সে উপনয়ন। তারপর পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতন, অমৃতসর হয়ে হিমালয়ে যান (১৮৭৩)। ফিরে এসে প্রথমে বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে যান, পরে তেরো বৎসর বয়সে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'অভিলাষ' নামক কবিতা মুদ্রিত হয়। (১৮৭৪)

মাতা সারদাদেবীর মৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ। (১৮৭৫)

বাৎসরিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। আর স্কুলে যান নি। এইখানেই বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ। (১৮৭৬)

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাতযাত্রা, উদ্দেশ্য ব্যারিস্টারি পড়া (১৮৭৮)। ব্রাইটনের এক স্কুলে ভর্তি হন। পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক মাস পড়েন। কিছু দিন পরে পিতার কাছ থেকে আদেশ এলো দেশে ফিরবার জন্যে। কারণ অজ্ঞাত। এক বৎসর পাঁচ মাস পরে দেশে ফিরে এলেন (১৮৮০)। ব্যারিস্টারি পড়া হোলো না। এর কিছু দিন

---

* রবীন্দ্রজীবনীকার পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা অবলম্বনে।

পর ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ স্থির করেন কিন্তু যাওয়া হয় নি। প্রায় আটমাস পরে পুনরায় এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ; কিন্তু মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন। (১৮৮১)

বিবাহ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩। যশোহরের ফুলতলা গ্রামবাসী বেণীমাধব চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে, বিবাহের পর নামকরণ করা হয় মৃণালিনী। রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ, ভবতারিণীর এগারো। বেণীমাধব ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন। বেণীমাধবের বাড়ী খুলনায় অথবা যশোহরে। দুটি নামই পাওয়া যায়। এমন কি প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় খুলনা ও যশোহর দুটিরই উল্লেখ করেছেন। আমাদের মতে গ্রামটি বিবাহের সময় যশোহর জেলায় ছিল, পরে খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় কিংবা তার বিপরীত।

জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা)-র জন্ম। (১৮৮৬)

জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম। (১৮৮৮)

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা ১৮৯০। কয়েকমাস পরই ফিরে এলেন, ফিরবার কিছু দিনের মধ্যেই জমিদারির ভার গ্রহণ করে জমিদারির দিকে রওনা হন।

দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা (রানী)-র জন্ম। (১৮৯১)

কনিষ্ঠা কন্যা মীরার জন্ম। (১৮৯৪)

কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে যোগদান।

কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম। (১৮৯৬)

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ। (১৯০১)

দেড়মাস পরে মধ্যমা কন্যা রেণুকার বিবাহ হয় সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা—২২শে ডিসেম্বর, ১৯০১, বাংলা ৭ই পৌষ, ১৩০৮, ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৫, শিক্ষকসংখ্যাও তাই।

শ্রীমৃণালিনী দেবীর মৃত্যু (সম্ভবতঃ যক্ষ্মারোগে) ২৩শে নভেম্বর, ১৯০২, বাংলা ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪১, মৃণালিনীর ২৯। মধ্যমা কন্যা রেণুকার যক্ষ্মারোগে মৃত্যু। (১৯০৩)

দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু। (১৯০৫)

বঙ্গচ্ছেদ। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫, বাংলা ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২। প্রতিবাদে দেশময় আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথও তাতে নিজেকে যুক্ত করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই সরে এলেন।

বরিশাল-নিবাসী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহ। মুঙ্গেরে কনিষ্ঠ পুত্র শমীর কলেরায় মৃত্যু। শমীর বয়স মাত্র ১১। (১৯০৭)

জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ। (১৯১০)

৫০তম জন্মোৎসব। ১৪ই মাঘ ১৩১৮।

বিলাতযাত্রা। গীতাঞ্জলির অনুবাদ, লণ্ডন থেকে আমেরিকায়, (১৯১২) ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে লণ্ডনে ইংরাজী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়।

দেশে ফিরে এলেন। (১৯১৩)

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি। কবির কাছে খবর পৌছায় ১৫ই নভেম্বর, ১৯১৩।

'স্যার' উপাধি-প্রাপ্তি। (১৯১৫)

জাপানযাত্রা। আমেরিকায়। (১৯১৬)

দ্বিতীয়বার জাপানে। (১৯১৭)

জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যু। (১৯১৮)

বিশ্বভারতীর পত্তন। ৮ই পৌষ, ১৩২৫, (১৯১৮)

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯, পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ডায়ারের আদেশে গুলীবর্ষণ। ফলে ৩৭৯ জন লোক নিহত। প্রতিবাদে ৩০শে মে, রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি বর্জন।

ইউরোপযাত্রা। সেখান থেকে আমেরিকায়। (১৯২০)

২২শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ, ১৩২৮ বিশ্বভারতীর ভার সাধারণের হাতে দেওয়া হোলো।

চীনযাত্রা, সেখান থেকে জাপানে। দেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা। (১৯২৪)

ইতালিযাত্রা। (১৯২৬)

কানাডাযাত্রা। সেখান থেকে জাপানে। (১৯২৯)

বিলাতযাত্রা। ইউরোপের আরও কয়েকটা দেশ ঘুরে রাশিয়ায়। ইউরোপ থেকে আমেরিকায়। (১৯৩০)

কলিকাতা টাউন-হলে জয়ন্তী-উৎসব। সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩১। কবির বয়স ৭০।

পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। (১৯৩২)

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭, শান্তিনিকেতনে একদিন সন্ধ্যাবেলা কবি হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৯৪০-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর কালিম্পঙ যাত্রা। ২৬শে অকস্মাৎ গুরুতর-রূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৯শে কলকাতায় ফিরলেন। ২৯শে নভেম্বর শান্তিনিকেতনে গেলেন। পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতায় আনা হোলো ২৫শে জুলাই, ১৯৪১।

৩০শে জুলাই বেলা ১১টা নাগাদ অপারেশন করলেন ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিনই সকাল ৯॥টায় মুখে মুখে তাঁর শেষ কবিতা রচনা করেন। অপারেশনে কোনো ফল হোলো না। অবস্থা ক্রমশঃই খারাপের দিকে গেল।

অবশেষে ৭ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার, ১৯৪১, ২২শে শ্রাবণ, রাখীবন্ধন, ১৩৪৮, বেলা ১২—১০ মিনিটে মহাপ্রস্থান করলেন কবিগুরু।

রবীন্দ্র রচনা পঞ্জী *

১৮৬৯ কবিতা লেখার সূত্রপাত।
১৮৭৩ 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামক নাটক রচনা।
১৮৭৪ 'অভিলাষ' নামক কবিতা প্রকাশ।
১৮৭৫ 'হিন্দু মেলার উপহার', 'প্রকৃতির খেদ', নামক কবিতা, 'জ্বল জ্বল চিতা' নামক গান এবং 'বনফুল' নামক কাব্য রচনা।
১৮৭৬ 'ভুবনমোহিনী' নামক কাব্য, 'প্রলাপ' নামক লিরিক কবিতার প্রকাশ।
১৮৭৭ 'ভানুসিংহের পদাবলী',† 'ভিখারিনী' নামক গল্প, 'করুণা' নামক উপন্যাস রচনা।
১৮৭৮ 'কবি-কাহিনী' নামক কাব্য রচনা।
১৮৭৯ 'মগ্ন ভগ্নতরী' নামক কবিতা রচনা।
১৮৮১ বাল্মীকি প্রতিভা, ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
১৮৮২ সন্ধ্যাসঙ্গীত, কালমৃগয়া।
১৮৮৩ বৌঠাকুরাণীর হাট, প্রভাত সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ।
১৮৮৪ ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।†
১৮৮৫ রামমোহন রায়, আলোচনা, রবিচ্ছায়া।
১৮৮৬ কড়ি ও কোমল।
১৮৮৭ রাজর্ষি, চিঠিপত্র।
১৮৮৮ সমালোচনা, মায়ার খেলা।
১৮৮৯ রাজা ও রানী।
১৮৯০ বিসর্জন, মন্ত্রী অভিষেক, মানসী।
১৮৯১ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী (১ম)।
১৮৯২ চিত্রাঙ্গদা, গোড়ার গলদ।
১৮৯৩ গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী (২য়)।
১৮৯৪ সোনার তরী, ছোট গল্প, বিচিত্র গল্প, কথাচতুষ্টয়।
১৮৯৫ ছেলেভুলানো ছড়া, গল্পদশক।
১৮৯৬ নদী, চিত্রা, সংস্কৃত শিক্ষা ১ম—২য়, কাব্যগ্রন্থাবলী।

* ঋণ-স্বীকার—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

† শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জীর ১৩ পৃষ্ঠায় ভানুসিংহের পদাবলী ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে বলে উল্লেখ আছে। মনে হয় পুস্তকখানি ১৮৮৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে থাকবে।

১৮৯৭ বৈকুণ্ঠের খাতা, পঞ্চভূত।
১৮৯৮
১৮৯৯ কণিকা।
১৯০০ কথা, কাহিনী, ব্রহ্মোপনিষদ, কল্পনা, ক্ষণিকা, গল্পগুচ্ছ (১ম)।
১৯০১ ঔপনিষদ ব্রহ্ম, ব্রহ্মমন্ত্র, নৈবেদ্য, গল্পগুচ্ছ (২য়)।
১৯০২
১৯০৩ চোখের বালি, কর্মফল, কাব্যগ্রন্থ।
১৯০৪ ইংরাজি সোপান (১ম), স্বদেশীসমাজ, রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী।
১৯০৫ আত্মশক্তি, বাউল, স্বদেশ, বিজয়া-সম্মিলন।
১৯০৬ ভারতবর্ষ, রাজভক্তি, দেশনায়ক, ইংরাজি সোপান (২য়), খেয়া, নৌকাডুবি।
১৯০৭ বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক।
১৯০৮ প্রজাপতির নির্বন্ধ, সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী, প্রহসন, পথ ও পাথেয়, রাজা-প্রজা, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ, গান, শারদোৎসব, মুকুট, শিক্ষা, কথা ও কাহিনী।
১৯০৯ ব্রহ্মসঙ্গীত, ধর্ম, শব্দতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, চয়নিকা, গান, শান্তিনিকেতন (১ম—৮ম), বিদ্যাসাগর-চরিত, শিশু, ছুটির পড়া, ইংরাজীপাঠ, ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা।
১৯১০ রাজা, ব্রহ্মসঙ্গীত, গোরা, গীতাঞ্জলি, শান্তিনিকেতন (৯ম—১১শ)।
১৯১১ শান্তিনিকেতন (১২শ—১৩শ), আটটি গল্প।
১৯১২ ডাকঘর, ধর্মশিক্ষা, ধর্মের অধিকার, গল্প চারিটি, জীবনস্মৃতি, মালিনী, ছিন্নপত্র, চৈতালি, অচলায়তন, পাঠসঞ্চয়, বিদায় অভিশাপ, Gitanjali.
১৯১৩ The Gardener, The Crescent Moon, Chitra, Glimpses of Bengal Life.
১৯১৪ স্মরণ, গীতিমাল্য, উৎসর্গ, গীতালি, গান, ধর্মসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি—দেবনাগরী অক্ষরে।
The King of the Dark Chamber, The Post Office, Sadhana, One hundred Poems of Kabir.
১৯১৫ শান্তিনিকেতন (১৪শ), বিচিত্র পাঠ, কাব্যগ্রন্থ।
The Maharani of Arakan.

১৯১৬ শান্তিনিকেতন (১৫শ—১৭শ), ফাল্গুনী, ঘরেবাইরে, সঞ্চয়, পরিচয়, বলাকা, চতুরঙ্গ, গল্পসপ্তক, কাব্যগ্রন্থ।
Fruit Gathering, Hungry Stones and Other Stories, Stray Birds.

১৯১৭ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, অনুবাদচর্চা।
The Cycle of Spring, My Reminiscences, Sacrifice and Other Plays, Personality, Nationalism, Selected Passages for Bengali Translation.

১৯১৮ গুরু, পলাতকা।
Lover's Gift and Crossing, Mashi and Other Stories, Stories from Tagore, Parrots' Training, At the Cross Road, The Fugitive. *[১]

১৯১৯ জাপানযাত্রী।
The Centre of Indian Culture, The Home and the World, Mother's Prayer, The Trial of the Horse.

১৯২০ অরূপরতন, পয়লা নম্বর।

১৯২১ শিক্ষার মিলন, ঋণশোধ।
Greater India, The Wreck, Poems from Tagore, Glimpses of Bengal, Thought Relics, The Fugitive. *[২]

১৯২২ মুক্তধারা, বর্ষামঙ্গল, লিপিকা, শিশু ভোলানাথ।
Creative Unity.

১৯২৩ বসন্ত

১৯২৪ Letters from Abroad, Gora, The Curse at Farewell.

১৯২৫ পূরবী, বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, গৃহপ্রবেশ, সঙ্কলন, গীতিচর্চা, প্রবাহিনী।
Talks in China, Poems (Tr. by Edward Thompson), Red Oleanders, Broken Ties and Other Stories.

১৯২৬ আচার্যের অভিভাষণ, প্রবাহিনী, চিরকুমারসভা, শোধবোধ, নটীর পূজা, ঋতু-উৎসব, রক্তকরবী, শেষবর্ষণ, লেখন।
The Meaning of Art.

---

* ১ Prose.

* ২ Poems.

১৯২৭ ঋতুরঙ্গ, লেখন।
১৯২৮ শেষরক্ষা, পল্লিপ্রকৃতি।
Fireflies, Letters to a friend, The Tagore Birthday Book, Lectures and Addresses, A Poet's School.
১৯২৯ যাত্রী, সমবায়নীতি, পরিত্রাণ, যোগাযোগ, তপতী, মহুয়া, শেষের কবিতা।
Thoughts from Tagore, On Oriental Culture and Mission.
১৯৩০ ভানুসিংহের পত্রাবলী, তপতী, শেষের কবিতা, মহুয়া, পাঠপ্রচয়, সহজপাঠ, ইংরেজী সহজ শিক্ষা।
The Religion of Man.
১৯৩১ রাশিয়ার চিঠি, নবীন, শাপমোচন, গীতোৎসব, সঞ্চয়িতা, গীত-বিতান, সহজ পাঠ, প্রতিভাষণ।
The Child.
১৯৩২ বনবাণী, গীতবিতান, দেশের কাজ, কালের যাত্রা, পুনশ্চ, পরিশেষ, মহাত্মাজীর শেষব্রত।
The Golden Boat, Mahatmaji and the Depressed Humanity.
১৯৩৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, দুই বোন, মানুষের ধর্ম, শিক্ষার বিকিরণ, তাসের দেশ, বাঁশরী, চণ্ডালিকা, বিচিত্রতা, ভারতপথিক রামমোহন।
১৯৩৪ বাঁশরী, মালঞ্চ, শ্রাবণগাথা, শ্রীভবন সম্বন্ধে আমার আদর্শ, চার অধ্যায়।
My Ideals with regard to the Sree Bhavana.
১৯৩৫ শেষসপ্তক, সুর ও সঙ্গতি, বীথিকা।
East and West, Twentysix songs of Tagore.
১৯৩৬ শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, প্রান্তনী, পত্রপুট, ছন্দ, জাপা-পারস্যে, শ্যামলী, সাহিত্যের পথে, পাশ্চাত্য ভ্রমণ।
Education Naturalised, An address, Collected Poems and Plays.
১৯৩৭ খাপছাড়া, কালান্তর, সে, ছড়ার ছবি, বিশ্বপরিচয়।
Man, China and India, Shri Ramkrishna Centenary.

১৯৩৮ প্রান্তিক, চণ্ডালিকা, পত্রধারা, পথে ও পথের প্রান্তে, সেঁজুতি, অভিভাষণ, বাংলা ভাষা-পরিচয়।
China and India.

১৯৩৯ প্রহাসিনী, আকাশ-প্রদীপ, নৃত্যনাট্য, চণ্ডালিকা, বাংলা ভাষা-পরিচয়, শ্যামা নৃত্যনাট্য, পথের সঞ্চয়, মহাজাতিসদন, অন্তর্দেবতা, প্রসাদ, রবীন্দ্ররচনাবলী, বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসবে বাণী।

১৯৪০ রবীন্দ্ররচনাবলী, নবজাতক, সানাই, চিত্রলিপি, ছেলেবেলা, তিন সঙ্গী, রোগশয্যায়, আরোগ্য।
My Boyhood Days.

১৯৪১ আরোগ্য, জন্মদিনে, সভ্যতার সংকট, গল্পসল্প, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, রবীন্দ্ররচনাবলী।
The Crisis in Civilisation.

রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গ্রন্থের প্রকাশকাল সম্পর্কে শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের সঙ্কলন (শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৪৮) এবং শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্কলন রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জীর মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে—

	শ্রীপুলিনবিহারী সেন		শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রবাহিনী	১৯২৬	...	১৯২৫
শেষবর্ষণ	১৯২৫	...	১৯২৬
লেখন	১৯২৬	...	১৯২৭
তপতী	১৯৩০	...	১৯২৯
শেষের কবিতা	১৯৩০	...	১৯২৯
মহুয়া	১৯৩০	...	১৯২৯
সহজ পাঠ	১৯৩০	...	১৯৩১
গীতবিতান	১৯৩২	...	১৯৩১
বাঁশরী	১৯৩৪	...	১৯৩৩
বাংলা ভাষা-পরিচয়	১৯৩৯	...	১৯৩৮
আরোগ্য	১৯৪০	...	১৯৪১

নির্দেশিকা

গ্রন্থঋণ

(১) কল্লোল যুগ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(২) রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(৩) পুণ্যস্মৃতি—শ্রীমতী সীতা দেবী

(৪) মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

(৫) কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

(৬) আত্মস্মৃতি—সজনীকান্ত দাস

(৭) এই যা দেখা—লীলা মজুমদার

(৮) সব পেয়েছির দেশে—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

(৯) স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১০) মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

(১১) বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

(১২) কবিকথা—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

(১৩) আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীমতী রানী চন্দ

(১৪) গুরুদেব— ঐ

(১৫) ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ

(১৬) চিঠিপত্র ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯—রবীন্দ্রনাথ

(১৭) নির্বাণ—শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

(১৮) বাইশে শ্রাবণ—শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ

(১৯) রবিচ্ছবি—শ্রীপ্রভাত গুপ্ত

(২০) স্বজনী—শ্রীমতী হেমলতা দেবী

(২১) রবীন্দ্র-কথা—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(২২) On the Edges of Time—Rathindranath Tagore.

(২৩) ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়—জসীমউদ্দীন

(২৪) কবি সার্বভৌম—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

(২৫) আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ
(২৬) রবীন্দ্র-স্মৃতি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
(২৭) কালিম্পঙের দিনগুলি – শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ
(২৮) জীবন-স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ
(২৯) রবীন্দ্র-জীবনী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(৩০) রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী— ঐ
(৩১) চিত্রা—রবীন্দ্রনাথ
(৩২) রবীন্দ্রমানসের উৎস-সন্ধানে—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী
(৩৩) পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ— ঐ
(৩৪) সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ— ঐ
(৩৫) রায়তের কথা—প্রমথ চৌধুরী
(৩৬) রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ
(৩৭) ছেলেবেলা— ঐ
(৩৮) শেষ লেখা— ঐ
(৩৯) মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩৬৯।
(৪০) শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৪৮ ; বৈশাখ, ১৩৬৮।
(৪১) দেশ—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯।
(৪২) যুগান্তর সাময়িকী—১৫ই বৈশাখ, ১৩৭০ ; যুগান্তর—২৫শে বৈশাখ, ১৩৭০।
(৪৩) বিশ্বভারতী পত্রিকা,—মাঘ-চৈত্র, ১৮৮০-১৮৮১ শক ;
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৮০০ শক।
(৪৪) আনন্দবাজার পত্রিকা—আনন্দমেলা, ২২শে বৈশাখ, ১৩৭০।